পশ্চিম বঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ

বাংলা পাঠ্যপুস্তক। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা।

পাঠ-সংকলন

পশ্চিম বঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ পক্ষে
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত

সূচীপত্র

পদ্যাংশ

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ

আত্মবিলাপ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১

আশার ছলনে ভুলি' কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে।
জীবন-প্রবাহ বহি' কালসিন্ধু-পানে যায়,
ফিরাব কেমনে ?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন—
তবু এ আশার নেশা, ছুটিল না, এ কি দায় !

২

রে প্রমত্ত মন মম ! কবে পোহাইবে রাতি ?
জাগিবি রে কবে ?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুমভাতি
কত দিন রবে ?
নীরবিন্দু দূর্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলমলে ?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি ?

৩

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে কি সুখ তার ?
জাগে সে কাঁদিতে।
ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁধিতে।

মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে,
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার।

৪

প্রেমের নিগড় গড়ি' পরিলি চরণে সাধে;
কি ফল লভিলি?
জ্বলন্ত পাবকশিখা-লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি?
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায়,
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরান কাঁদে।

৫

বাকি কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে
কমল তুলিতে।
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী;
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে?

৬

যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়,
কব তা কাহারে?
সুগন্ধ কুসুমগন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ!
এই কি লভিলি লাভ অনাহারে অনিদ্রায়?

৭

মুকুতাফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু-জলতলে
ফেলিস, পামর !
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে ?

কাশীরাম দাস

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃতহ্রদে রাখিলা তেমতি,
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি' ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন !)
সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি' মায়ে, এ তিন ভুবন ;
সেইরূপে ভাষা-পথ খননি' স্ববলে
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে।
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান,—
হে কাশী! কবীশ-দলে তুমি পুণ্যবান্‌ ॥

আশা

নবীনচন্দ্র সেন

ধন্য, আশা কুহকিনি! তোমার মায়ায়
মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন।
দুর্বল মানব-মনোমন্দিরে তোমায়
যদি না সৃজিত বিধি, হায়! অনুক্ষণ
নাহি বিরাজিতে তুমি যদি সে মন্দিরে;
শোক, দুঃখ, ভয়, ত্রাস, নিরাশ-প্রণয়,
চিন্তার অচিন্ত্য অস্ত্র নাশিত অচিরে
সে মনোমন্দির-শোভা! পলাত নিশ্চয়
অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানদেবী ছাড়িয়া আবাস;
উন্মত্ততা ব্যাঘ্ররূপে করিত নিবাস।

ধন্য, আশা কুহকিনি! তোমার মায়ায়
অসার সংসারচক্র ঘোরে নিরবধি!
দাঁড়াইত স্থিরভাবে, চলিত না হায়,
মন্ত্রবলে তুমি চক্র না ঘুরাতে যদি!
ভবিষ্যৎ-অন্ধ মূঢ় মানবসকল
ঘুরিতেছে কর্মক্ষেত্রে বর্তুল-আকার

তব ইন্দ্রজালে মুগ্ধ ; পেয়ে তব বল
যুঝিছে জীবন-যুদ্ধ হায়, অনিবার।
নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে,
নাচাও তেমতি তুমি অর্বাচীন নরে।

ওই যে কাঙাল বসি' রাজপথ-ধারে,—
দীনতার প্রতিমূর্তি !—কঙ্কাল-শরীর,
জীর্ণ পরিধেয় বস্ত্র, দুর্গন্ধ-আধার ;
দু নয়নে অভাগার বহিতেছে নীর।
ভিক্ষা করি' দ্বারে দ্বারে এ তিন প্রহর
পাইয়াছে যাহা, তাহে জঠর-অনল
নাহি হবে নির্বাপিত ; রুগ্‌ণ কলেবর ;
চলে না চরণ, চক্ষে ঘোরে ধরাতল।
কি মন্ত্র কহিলে তুমি অভাগার কানে,
চলিল অভাগা পুনঃ ভিক্ষার সন্ধানে।

অথবা সুদূরে কেন করি অন্বেষণ ?
দুরাশার মন্ত্রে মুগ্ধ আমি মূঢ়মতি !
নতুবা যে পথে কোন কবি বিচরণ
করে নি, সে পথে কেন হবে মম গতি ?
বঙ্গ-ইতিহাস, হায়, মণিপূর্ণ খনি !
কবির কল্পনালোকে কিন্তু আলোকিত
নহে যা, কেমনে আমি, বল কুহকিনি,
মম ক্ষুদ্র কল্পনায় করি প্রকাশিত ?

না আলোকে যদি শশী তিমিরা রজনী,
নক্ষত্রের নহে সাধ্য উজলে ধরণী।

কোন্ পুণ্যবলে সেই খনির ভিতরে
প্রবেশি' গাঁথিয়া মালা অবিদ্ধ রতনে
দোলাইব মাতৃভাষা-কম-কলেবরে—
সুকবি-সুকরে-গাঁথা মহাকাব্য-ধনে
সজ্জিত যে বরবপুঃ? কিংবা অসম্ভব
নহে কিছু, হে দুরাশে, তোমার মায়ায়;
কত ক্ষুদ্র নর, ধরি পদ-ছায়া তব,
লভিয়াছে অমরতা এ মর ধরায়;
অতএব দয়া করি' কহ, দয়াবতি!
কি চিত্রে রঞ্জিছ আজি শ্বেত-সেনাপতি?

শ্রাবণে

অক্ষয়কুমার বড়াল

সারা দিন একখানি জল-ভরা কালো মেঘ
রহিয়াছে ঢাকিয়া আকাশ;
ব'সে জানালার পাশে, সারা দিন আছি চেয়ে—
জীবনের আজি অবকাশ!
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে, তরুগুলি হেলে-দোলে,
ফুলগুলি পড়েছে খসিয়া;

লতাদের মাথাগুলি মাটিতে পড়েছে লুটি ;
পাখীগুলি ভিজিছে বসিয়া।

কোথা সাড়াশব্দ নাই, পথে লোকজন নাই,
হেথা-হোথা দাঁড়ায়েছে জল ;
ভিজা ঘাসঝাড় হতে লাফায় ফড়িঙ কভু,
জলায় ডাকিছে ভেকদল।
চাতক, ঝাড়িয়া পাখা, ডাকিয়া ফটিক-জল,
ছাড়ি' নীড়, উঠিছে আকাশে ;
কদম্ব-কেতকী-বাস কাঁপিছে বাতাসে ধীরে ;
গেছে ধরা ঢেকে' শ্যাম ঘাসে।

দীঘিটি গিয়াছে ভরে, সিঁড়িটি গিয়াছে ডুবে,
কানায় কানায় কাঁপে জল ;
বৃষ্টি-ভরে বায়ু-ভরে নুয়ে পড়ে বার বার
আধ-ফোটা কুমুদ কমল।
তীরে নারিকেল-মূলে থল্-থল্ করে জল,
ডাহুক ডাহুকী কূলে ডাকে ;
সারি দিয়া মরালীরা ভাসিছে তুলিয়া গ্রীবা,
লুকাইছে কভু দাম-ঝাঁকে।

পাড়ে পাড়ে চকা চকী বসে আছে দুটি দুটি ;
বলাকা মেঘের কোলে ভাসে ;
ক্বচিৎ গ্রামের বধূ শূন্য কুম্ভ লয়ে কাঁখে,
তরুতল দিয়া ধীরে আসে।

ক্বচিৎ অশ্বত্থতলে ভিজিছে একটি গাভী,
টোকা মাথে যায় কোন চাষী ;
ক্বচিৎ মেঘের কোলে, মুমূর্ষুর হাসি সম,
চমকিছে বিজলীর হাসি।

মাঠে নবশ্যাম ক্ষেতে কচি কচি ধান-গাছ
মাথাগুলি জাগাইয়া আছে—
কোলে লুটিতেছে জল টল্-মল্ থল্-থল্
বুকে বায়ু থর-থর নাচে।
সুদূরে মাঠের শেষে জমে আছে অন্ধকার,
কোথা যেন হতেছে প্রলয় !
কুটীরে বসিয়া গৃহী পুত্র-পরিবার-সহ
কত দুর্যোগের কথা কয়।

চেয়ে আছি শূন্য-পানে, কোন কাজ হাতে নাই—
কোন কাজে নাহি বসে মন !
তন্দ্রা আছে, নিদ্রা নাই, দেহ আছে, মন নাই ;
ধরা যেন অস্ফুট স্বপন !
এই উঠি, এই বসি ; কেন উঠি, কেন বসি !
এই শুই, এই গান গাই।
কি গান— কাহার গান ! কি সুর, কি ভাব তার !
ছিল কভু, আজ মনে নাই !

ভারততীর্থ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে
নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই-যে ভূধর,
নদীজপমালাধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র
ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা।

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য,
হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শকহূনদল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।
পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে,
যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

রণধারা বাহি জয়গান গাহি
উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত
যারা এসেছিল সবে,
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তারি বিচিত্র সুর।
হে রুদ্রবীণা, বাজো বাজো বাজো,
ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজো,
বন্ধ নাশিবে, তারাও আসিবে
দাঁড়াবে ঘিরে—

এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

হেথা একদিন বিরামবিহীন
মহা ওংকারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রনরনি।
তপস্যাবলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনতশিরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

সেই হোমানলে হেরো আজি জ্বলে
দুখের রক্ত শিখা,
হবে তা সহিতে মর্মে দহিতে
আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখ বহন করো মোর মন,
শোনো রে একের ডাক।

যত লাজ ভয় করো করো জয়,
অপমান দূরে যাক।
দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ।
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

এসো হে আর্য, এসো অনার্য
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খ্রীস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, করো অপনীত
সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা
তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

দুর্ভাগা দেশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে
দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হয়ে
ধুলায় সে যায় বয়ে—
সেই নিম্নে নেমে এসো, নহিলে নাহি রে পরিত্রাণ।
অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান।

যারে তুমি নীচে ফেল' সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে
আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি
দেখিবারে পাও না কি
নেমেছে ধুলার তলে হীন-পতিতের ভগবান।
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান।

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে।
সবারে না যদি ডাক',
এখনো সরিয়া থাক',
আপনারে বেঁধে রাখ' চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।

ন্যায়দণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে, প্রত্যেকের 'পরে
দিয়েছ শাসনভার, হে রাজাধিরাজ।
সে গুরু সম্মান তব, সে দুরূহ কাজ,
নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য করি
সবিনয়ে। তব কার্যে যেন নাহি ডরি
কভু কারে।

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

মস্তকবিক্রয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাবস্তুবদান

কোশল-নৃপতির তুলনা নাই,
জগৎ জুড়ি যশোগাথা।
ক্ষীণের তিনি সদা শরণ-ঠাঁই,
দীনের তিনি পিতামাতা।
সে কথা কাশীরাজ শুনিতে পেয়ে
জ্বলিয়া মরে অভিমানে—
"আমার প্রজাগণ আমার চেয়ে
তাহারে বড়ো করি মানে!
আমার হতে যার আসন নীচে
তাহার দান হল বেশী!
ধর্ম দয়া মায়া সকলি মিছে,
এ শুধু তার রেষারেষি।"
কহিলা, "সেনাপতি, ধরো কৃপাণ,
সৈন্য করো সব জড়ো।
আমার চেয়ে হবে পুণ্যবান্,
স্পর্ধা বাড়িয়াছে বড়ো!"
চলিলা কাশীরাজ যুদ্ধসাজে—
কোশলরাজ হারি রণে

রাজ্য ছাড়ি দিয়া ক্ষুব্ধ লাজে
পলায়ে গেল দূর বনে।
কাশীর রাজা হাসি কহে তখন
আপন সভাসদ-মাঝে,
"ক্ষমতা আছে যার রাখিতে ধন
তারেই দাতা হওয়া সাজে।"

সকলে কাঁদি বলে, "দারুণ রাহু
এমন চাঁদেরেও হানে!
লক্ষ্মী খোঁজে শুধু বলীর বাহু,
চাহে না ধর্মের পানে!"
"আমরা হইলাম পিতৃহারা"
কাঁদিয়া কহে দশ দিক্,
"সকল জগতের বন্ধু যাঁরা
তাঁদের শত্রুরে ধিক্।"
শুনিয়া কাশীরাজ উঠিল রাগি—
"নগরে কেন এত শোক!
আমি তো আছি, তবু কাহার লাগি
কাঁদিয়া মরে যত লোক!
আমার বাহুবলে হারিয়া তবু
আমারে করিবে সে জয়!
অরির শেষ নাহি রাখিবে কভু,
শাস্ত্রে এইমতো কয়।

মন্ত্রী, রটি দাও নগর-মাঝে,
ঘোষণা করো চারিধারে—
যে ধরি আনি দিবে কোশলরাজে
কনক শত দিব তারে।”
ফিরিয়া রাজদূত সকল বাটী
রটনা করে দিনরাত।
যে শোনে আঁখি মুদি রসনা কাটি
শিহরি কানে দেয় হাত।

রাজ্যহীন রাজা গহনে ফিরে
মলিনচীর দীনবেশে—
পথিক একজন অশ্রুনীরে
একদা শুধাইল এসে,
“কোথা গো বনবাসী, বনের শেষ,
কোশলে যাব কোন্ মুখে।”
শুনিয়া রাজা কহে, “অভাগা দেশ,
সেথায় যাবে কোন্ দুখে।”
পথিক কহে, “আমি বণিকজাতি,
ডুবিয়া গেছে মোর তরী।
এখন দ্বারে দ্বারে হস্ত পাতি
কেমনে রব প্রাণ ধরি!
করুণাপারাবার কোশলপতি,
শুনেছি নাম চারিধারে—

অনাথনাথ তিনি দীনের গতি,
চলেছে দীন তাঁরি দ্বারে।”
শুনিয়া নৃপসুত ঈষৎ হেসে
রুধিলা নয়নের বারি,
নীরবে ক্ষণকাল ভাবিয়া শেষে
কহিলা নিশ্বাস ছাড়ি,
“পান্থ, যেথা তব বাসনা পূরে
দেখায়ে দিব তারি পথ।
এসেছ বহু দুখে অনেক দূরে,
সিদ্ধ হবে মনোরথ।”

বসিয়া কাশীরাজ সভার মাঝে;
দাঁড়াল জটাধারী এসে।
“হেথায় আগমন কিসের কাজে”
নৃপতি শুধাইল হেসে।
“কোশলরাজ আমি, বন-ভবন”
কহিলা বনবাসী ধীরে—
“আমার ধরা পেলে যা দিবে পণ
দেহো তা মোর সাথীটিরে।”
উঠিল চমকিয়া সভার লোকে,
নীরব হল গৃহতল;
বর্ম-আবরিত দ্বারীর চোখে
অশ্রু করে ছলছল।

মৌন রহি রাজা ক্ষণেক-তরে
হাসিয়া কহে, "ওহে বন্দী,
মরিয়া হবে জয়ী আমার 'পরে
এমনি করিয়াছ ফন্দি !
তোমার সে আশায় হানিব বাজ,
জিনিব আজিকার রণে—
রাজ্য ফিরি দিব হে মহারাজ,
হৃদয় দিব তারি সনে।"

জীর্ণ-চীর-পরা বনবাসীরে
বসাল নৃপ রাজাসনে,
মুকুট তুলি দিল মলিন শিরে—
'ধন্য' কহে পুরজনে।

পূজারিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবদানশতক

নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইল
পাদনখকণা তাঁর।
স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদকাননে
তাহারি উপরে রচিলা যতনে

অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপ,
শিল্পশোভার সার।

সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি
রাজবধূ রাজবালা
আসিতেন ফুল সাজায়ে ডালায়,
স্তূপপদমূলে সোনার থালায়
আপনার হাতে দিতেন জ্বালায়ে
কনকপ্রদীপমালা।

অজাতশত্রু রাজা হল যবে
পিতার আসনে আসি
পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হতে,
সঁপিল যজ্ঞ-অনল-আলোতে
বৌদ্ধশাস্ত্ররাশি।

কহিল ডাকিয়া অজাতশত্রু
রাজপুরনারী সবে,
"বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার,
এই কটি কথা জেনো মনে সার—
ভুলিলে বিপদ হবে।"

সেদিন শারদ-দিবা-অবসান—
   শ্রীমতী নামে সে দাসী
পুণ্যশীতল সলিলে নাহিয়া
পুষ্পপ্রদীপ থালায় বাহিয়া
রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া
   নীরবে দাঁড়াল আসি।

শিহরি সভয়ে মহিষী কহিলা,
   "এ কথা নাহি কি মনে,
অজাতশত্রু করেছে রটনা,
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্যরচনা
শূলের উপরে মরিবে সে জনা
   অথবা নির্বাসনে।"

সেথা হতে ফিরি গেল চলি ধীরে
   বধূ অমিতার ঘরে।
সমুখে রাখিয়া স্বর্ণমুকুর
বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর,
আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদুর
   সীমন্তসীমা-'পরে।

শ্রীমতীরে হেরি বাঁকি গেল রেখা,
   কাঁপি গেল তার হাত—
কহিল, "অবোধ, কী সাহস-বলে
এনেছিস পূজা, এখনি যা চলে—

কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তা হলে
বিষম বিপদপাত ।”

অস্তরবির রশ্মি-আভায়
খোলা জানালার ধারে
কুমারী শুক্লা বসি একাকিনী
পড়িতে নিরত কাব্যকাহিনী ;
চমকি উঠিল শুনি কিংকিণী,
চাহিয়া দেখিল দ্বারে ।

শ্রীমতীরে হেরি পুঁথি রাখি ভূমে
দ্রুতপদে গেল কাছে ।
কহে সাবধানে তার কানে কানে,
“রাজার আদেশ আজি কে না জানে,
এমন করে কি মরণের পানে
ছুটিয়া চলিতে আছে ।”

দ্বার হতে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী
লইয়া অর্ঘ্যথালি ।
“হে পুরবাসিনী” সবে ডাকি কয়,
“হয়েছে প্রভুর পূজার সময় ।”—
শুনি ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়,
কেহ দেয় তারে গালি ।

দিবসের শেষ আলোক মিলাল
নগরসৌধ-'পরে।
পথ জনহীন আঁধারে বিলীন,
কলকোলাহল হয়ে এল ক্ষীণ,
আরতিঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন
রাজদেবালয়-ঘরে।

শারদ নিশির স্বচ্ছ তিমিরে
তারা অগণ্য জ্বলে।
সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ,
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,
"মন্ত্রণাসভা হল সমাধান"
দ্বারী ফুকারিয়া বলে।

এমন সময়ে হেরিলা চমকি
প্রাসাদে প্রহরী যত—
রাজার বিজন কানন-মাঝারে
স্তূপপদমূলে গহন আঁধারে
জ্বলিতেছে কেন যেন সারে সারে
প্রদীপমালার মতো।

মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক
তখনি ছুটিয়া আসি
শুধাল, "কে তুই ওরে দুর্মতি,
মরিবার তরে করিস আরতি।"

মধুর কণ্ঠে শুনিল, "শ্রীমতী,
আমি বুদ্ধের দাসী।"

সেদিন শুভ্র পাষাণফলকে
পড়িল রক্তলিখা।
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদকাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে
শেষ আরতির শিখা।

প্রতিনিধি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অ্যাক্‌ওয়ার্থ্‌ সাহেব কয়েকটি মরাঠী গাথার যে ইংরেজি অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই ভূমিকা হইতে বর্ণিত ঘটনা গৃহীত। শিবাজির গেরুয়া পতাকা 'ভাগোয়া ঝণ্ডা' নামে খ্যাত।

বসিয়া প্রভাতকালে সেতারার দুর্গভালে
শিবাজি হেরিলা এক দিন—
রামদাস, গুরু তাঁর, ভিক্ষা মাগি দ্বার দ্বার
ফিরিছেন যেন অন্নহীন।
ভাবিলা, এ কী এ কাণ্ড! গুরুজির ভিক্ষাভাণ্ড!
ঘরে যাঁর নাই দৈন্যলেশ!
সবি যাঁর হস্তগত, রাজ্যেশ্বর পদানত,
তাঁরো নাই বাসনার শেষ!

এ কেবল দিনে রাত্রে জল ঢেলে ফুটা পাত্রে
বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে।
কহিলা, দেখিতে হবে কতখানি দিলে তবে
ভিক্ষা-ঝুলি ভরে একেবারে।
তখনি লেখনী আনি কী লিখি দিলা কী জানি,
বালাজিরে কহিলা ডাকায়ে,
"গুরু যবে ভিক্ষা-আশে আসিবেন দুর্গ-পাশে
এই লিপি দিয়ো তাঁর পায়ে।"

গুরু চলেছেন গেয়ে, সম্মুখে চলেছে ধেয়ে
কত পান্থ, কত অশ্বরথ—
"হে ভবেশ, হে শংকর, সবারে দিয়েছ ঘর,
আমারে দিয়েছ শুধু পথ।
অন্নপূর্ণা মা আমার লয়েছে বিশ্বের ভার,
সুখে আছে সর্ব চরাচর—
মোরে তুমি হে ভিখারী, মার কাছ হতে কাড়ি
করেছ আপন অনুচর।"

সমাপন করি গান সারিয়া মধ্যাহ্নস্নান
দুর্গদ্বারে আসিলা যখন
বালাজি নমিয়া তাঁরে দাঁড়াইল এক ধারে
পদমূলে রাখিয়া লিখন।
গুরু কৌতূহলভরে তুলিয়া লইলা করে,
পড়িয়া দেখিলা পত্রখানি—

বন্দি তাঁর পাদপদ্ম শিবাজি সঁপিছে অস্ত
তাঁরে নিজ রাজ্য-রাজধানী।

পরদিনে রামদাস গেলেন রাজার পাশ;
কহিলেন, "পুত্র, কহো শুনি,
রাজ্য যদি মোরে দেবে কী কাজে লাগিবে এবে—
কোন্ গুণ আছে তব, গুণী।"
"তোমারি দাসত্বে প্রাণ আনন্দে করিব দান"
শিবাজি কহিলা নমি তাঁরে।
গুরু কহে, "এই ঝুলি লহো তবে স্কন্ধে তুলি,
চলো আজি ভিক্ষা করিবারে।"

শিবাজি গুরুর সাথে ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে
ফিরিলেন পুরদ্বারে-দ্বারে।
নৃপে হেরি ছেলে মেয়ে ভয়ে ঘরে যায় ধেয়ে,
ডেকে আনে পিতারে মাতারে।
অতুল ঐশ্বর্যে রত তাঁর ভিখারীর ব্রত,
এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা।
ভিক্ষা দেয় লজ্জাভরে, হস্ত কাঁপে থরোথরে;
ভাবে, ইহা মহতের লীলা।

দুর্গে দ্বিপ্রহর বাজে, ক্ষান্ত দিয়া কর্ম-কাজে
বিশ্রাম করিছে পুরবাসী।
একতারে দিয়ে তান রামদাস গাহে গান
আনন্দে নয়নজলে ভাসি,

"ওহে ত্রিভুবনপতি, বুঝি না তোমার মতি,
কিছুই অভাব তব নাহি—
হৃদয়ে হৃদয়ে তবু ভিক্ষা মাগি ফির প্রভু,
সবার সর্বস্ব-ধন চাহি।"

অবশেষে দিবসান্তে নগরের এক প্রান্তে
নদীকূলে সন্ধ্যাস্নান সারি
ভিক্ষা-অন্ন রাঁধি সুখে গুরু কিছু দিলা মুখে,
প্রসাদ পাইল শিষ্য তাঁরি।
রাজা তবে কহে হাসি, "নৃপতির গর্ব নাশি
করিয়াছ পথের ভিক্ষুক ;
প্রস্তুত রয়েছে দাস— আরো কিবা অভিলাষ,
গুরু-কাছে লব গুরু দুখ।"

গুরু কহে, "তবে শোন্, করিলি কঠিন পণ,
অনুরূপ নিতে হবে ভার—
এই আমি দিনু কয়ে, মোর নামে মোর হয়ে
রাজ্য তুমি লহো পুনর্বার।
তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি,
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন ;
পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম,
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।

বৎস, তবে এই লহো মোর আশীর্বাদ-সহ
আমার গেরুয়া গাত্রবাস ;

বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো।"
কহিলেন গুরু রামদাস।
নৃপশিষ্য নতশিরে বসি রহে নদীতীরে,
চিন্তারাশি ঘনায় ললাটে।
থামিল রাখাল-বেণু, গোঠে ফিরে গেল ধেনু,
পরপারে সূর্য গেল পাটে।

পূরবীতে ধরি তান একমনে রচি গান
গাহিতে লাগিলা রামদাস,
"আমারে রাজার সাজে বসায়ে সংসার-মাঝে
কে তুমি আড়ালে কর বাস।
হে রাজা, রেখেছি আনি তোমারি পাদুকাখানি,
আমি থাকি পাদপীঠতলে।
সন্ধ্যা হয়ে এল ওই, আর কত বসে রই,
তব রাজ্যে তুমি এস চলে।"

জুতা-আবিষ্কার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কহিলা হবু, "শুন গো গোবুরায়,
কালিকে আমি ভেবেছি সারা রাত্র—
মলিন ধুলা লাগিবে কেন পায়
ধরণী-মাঝে চরণ ফেলা মাত্র।

তোমরা শুধু বেতন লহ বাঁটি,
রাজার কাজে কিছুই নাহি দৃষ্টি।
আমার মাটি লাগায় মোরে মাটি,
রাজ্যে মোর এ কী এ অনাসৃষ্টি।
শীঘ্র এর করিবে প্রতিকার,
নহিলে কারো রক্ষা নাহি আর।"

শুনিয়া গোবু ভাবিয়া হল খুন,
দারুণ ত্রাসে ঘর্ম বহে গাত্রে।
পণ্ডিতের হইল মুখ চুন,
পাত্রদের নিদ্রা নাহি রাত্রে।
রান্নাঘরে নাহিকো চড়ে হাঁড়ি,
কান্নাকাটি পড়িল বাড়ি-মধ্যে,
অশ্রুজলে ভাসায়ে পাকা দাড়ি
কহিলা গোবু হবুর পাদপদ্মে—
"যদি না ধুলা লাগিবে তব পায়ে
পায়ের ধুলা পাইব কী উপায়ে।"

শুনিয়া রাজা ভাবিল দুলি দুলি ;
কহিল শেষে, "কথাটা বটে সত্য।
কিন্তু আগে বিদায় করো ধূলি,
ভাবিয়ো পরে পদধূলির তত্ত্ব।
ধুলা-অভাবে না পেলে পদধুলা
তোমরা সবে মাহিনা খাও মিথ্যে,

কেন বা তবে পুষিনু এতগুলা
উপাধি-ধরা বৈজ্ঞানিক ভৃত্যে।
আগের কাজ আগে তো তুমি সারো,
পরের কথা ভাবিয়ো পরে আরো।”

আঁধার দেখে রাজার কথা শুনি,
যতন-ভরে আনিল তবে মন্ত্রী
যেখানে যত আছিল জ্ঞানী গুণী—
দেশে বিদেশে যতেক ছিল যন্ত্রী।
বসিল সবে চশমা চোখে আঁটি,
ফুরায়ে গেল উনিশ পিপে নস্য।
অনেক ভেবে কহিল, “গেলে মাটি
ধরায় তবে কোথায় হবে শস্য।”
কহিল রাজা, “তাই যদি না হবে
পণ্ডিতেরা রয়েছে কেন তবে।”

সকলে মিলি যুক্তি করি শেষে
কিনিল ঝাঁটা সাড়ে সতেরো লক্ষ,
ঝাঁটের চোটে পথের ধুলা এসে
ভরিয়া দিল রাজার মুখ বক্ষ।
ধুলায় কেহ মেলিতে নারে চোখ,
ধুলার মেঘে পড়িল ঢাকা সূর্য;
ধুলার বেগে কাশিয়া মরে লোক,
ধুলার মাঝে নগর হল উহ্য।

কহিল রাজা, "করিতে ধুলা দূর
জগৎ হল ধুলায় ভরপুর।"

তখন বেগে ছুটিল ঝাঁকে ঝাঁক
মশক কাঁখে একুশ লাখ ভিস্তি।
পুকুরে বিলে রহিল শুধু পাঁক,
নদীর জলে নাহিকো চলে কিস্তি।
জলের জীব মরিল জল বিনা,
ডাঙার প্রাণী সাঁতার করে চেষ্টা।
পাঁকের তলে মজিল বেচা-কিনা,
সর্দিজ্বরে উজাড় হল দেশটা।
কহিল রাজা, "এমনি সব গাধা,
ধুলারে মারি করিয়া দিল কাদা।"

আবার সবে ডাকিল পরামর্শে;
বসিল পুন যতেক গুণবন্ত—
ঘুরিয়া মাথা হেরিল চোখে সর্ষে,
ধুলার হায় নাহিকো পায় অন্ত।
কহিল, "মহী মাদুর দিয়ে ঢাকো,
ফরাশ পাতি করিব ধুলা বন্ধ।"
কহিল কেহ, "রাজারে ঘরে রাখো,
কোথাও যেন না থাকে কোনো রন্ধ্র।
ধুলার মাঝে না যদি দেন পা
তা হলে পায়ে ধুলা তো লাগে না।"

কহিল রাজা, "সে কথা বড়ো খাঁটি,
কিন্তু মোর হতেছে মনে সন্ধ—
মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি
দিবস রাতি রহিলে আমি বন্ধ।"
কহিল সবে, "চামারে তবে ডাকি
চর্ম দিয়া মুড়িয়া দাও পৃথ্বী।
ধূলির মহী ঝুলির মাঝে ঢাকি
মহীপতির রহিবে মহাকীর্তি।"
কহিল সবে, "হবে সে অবহেলে
যোগ্যমতো চামার যদি মেলে।"

রাজার চর ধাইল হেথা হোথা,
ছুটিল সবে ছাড়িয়া সব-কর্ম।
যোগ্যমতো চামার নাহি কোথা,
না মিলে তত উচিতমতো চর্ম।
তখন ধীরে চামার-কুলপতি
কহিল এসে ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ,
"বলিতে পারি করিলে অনুমতি
সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ।
নিজের দুটি চরণ ঢাকো, তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।"

কহিল রাজা, "এত কি হবে সিধে,
ভাবিয়া ম'ল সকল দেশসুদ্ধ।"

মন্ত্রী কহে, "বেটারে শূল বিঁধে
কারার মাঝে করিয়া রাখো রুদ্ধ।"
রাজার পদ চর্ম-আবরণে
ঢাকিল বুড়া বসিয়া পদোপান্তে।
মন্ত্রী কহে, "আমারো ছিল মনে,
কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে।"
সেদিন হতে চলিল জুতো পরা;
বাঁচিল গোবু, রক্ষা পেল ধরা।

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে এ বিশ্বনিখিল তোমারি প্রতিমা;
মন্দির তোমার কি গড়িব মা গো! মন্দির যাঁহার দিগন্ত নীলিমা!
তোমার প্রতিমা শশী, তারা, রবি,
সাগর, নির্ঝর, ভূধর, অটবী,
নিকুঞ্জভবন, বসন্তপবন, তরু, লতা, ফল, ফুলমধুরিমা।
সতীর পবিত্র প্রণয়-মধু, —মা!
শিশুর হাসিটি, জননীর চুমা,
সাধুর ভকতি, প্রতিভা, শকতি,
—তোমারি মাধুরী তোমারি মহিমা;
যেই দিকে চাই এ নিখিল ভূমি—
শতরূপে মা গো বিরাজিত তুমি,

বসন্তে, কি শীতে, দিবসে, নিশীথে,
বিকশিত তব বিভবগরিমা।
তথাপি মাটির এ প্রতিমা গড়ি,
তোমারে পূজিতে চাই মা ঈশ্বরি!
অমর কবির হৃদয় গভীর
ভাষায় যাহার দিতে নারে সীমা;
খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা,
দেখি না আপনি দিয়েছ মা ধরা,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে হাতটি বাড়ায়ে,
ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ী মা!

মা আমার

কামিনী রায়

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুখিনী জনমভূমি— মা আমার, মা আমার।

অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া-মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে;
ছোটখাটো সুখ দুঃখ— কে হিসাব রাখে তার,
তুমি যবে চাহ কাজ— মা আমার, মা আমার।

অতীতের কথা কহি বর্ত্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায়;
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার,
মরিব তোমারি তরে— মা আমার, মা আমার।

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কে বা ধরে?
যত দিনে না ঘুচিবে তোমার কলঙ্কভার,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ— মা আমার, মা আমার।

জীবন-ভিক্ষা

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

বুদ্ধদেবের প্রতি কিসা গোতমী

"দেউলে দেউলে কাঁদিয়া ফিরি গো, দুলালে আগলি' বক্ষে,
উষ্ণ বিয়োগ-উৎস-সরিৎ দর-বিগলিত চক্ষে,
শত চুম্বনে মেলে না নয়ন, চুরি গেছে মোর আঁচলের ধন;
অভাগী বিহগী আজিকে আহত মরণ-শ্যেনের পক্ষে।

স্তন-ক্ষীরধার অধরে বাছার আজি কি লেগেছে তিক্ত?
রসনা-প্রসূন কোন্ পরসাদ-মধুরসে পরিষিক্ত?
মুখ-চম্পকে মরুর বর্ণ, শুষ্ক অধর-কমল-পর্ণ—
কি পাপে আমার প্রাণের ইন্দু পীযূষ-বিন্দু-রিক্ত?

কোথা সে মাধুরী আধ আধ বোলে? কুন্দ বৃন্ত-ছিন্ন,
দন্ত-রুচিতে কই সে কান্তি পুণ্য-হাসির চিহ্ন?
জানি প্রভু, তব পাণির পরশে ননীর পুতলি জাগিবে হরষে।
কোন্ পাষাণের বিষবাণে তার নয়নের মণি ভিন্ন?

অবনীর এই পদ্ম-বেদীতে, হরিলে ত্রিতাপ-দুঃখ,
যাত্রা করেছ, দুরগম পথ ক্ষুরধার-সম সূক্ষ্ম।
দিয়ে তপোবল, মহানির্বাণ, কুমারে আমার করো প্রাণদান।"
লুটায় যুবতী বুদ্ধ-চরণে আলুথালু কেশ রুক্ষ।

কহেন বুদ্ধ, "তনয় তোমার নীরব-সমাধি-মগ্ন,
বরণ করেছে চিরসুন্দর মরণের মহালগ্ন।
থাকে যদি কোথা অশোকনিলয়, ভিখ্ মাগি আনো সর্ষপচয়,
পরশে তাহার দুলিয়া উঠিবে পরান-মৃণাল ভগ্ন।"

বিশাল পুরীর দ্বারে দ্বারে ঘুরে, কেহ নাহি দেয় ভিক্ষা;
নিবেদিল শেষে গুরুপদে এসে—"শিখাইলে শেষ শিক্ষা,
জীয়াতে চাহি না তনয়ে আমার, ভবনে ভবনে ওঠে হাহাকার—
হরো জগতের বিরহ-আঁধার, দাও গো অমৃতদীক্ষা।"

খেয়া-ডিঙি

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

পাটের খেতের ভিতর দিয়ে ঘাটের ডিঙা বাই—
তবু আমার হাটের সাথে কোনও বাঁধন নাই ;
শিরা-ওঠা ফাটা হাতে হালের গোড়া ধরি'
আমি শুধু আপন মনে এপার-ওপার করি ।

তোমরা ভাবো— খেত আর ফসল, বৃষ্টি বাদল বান,
ডুবল কত বাঁচল কত ভরা ভাদুই ধান,
আমার কিন্তু সে সব দিকে খেয়াল-খবর নাই—
আমি আমার নিয়ম-মতন ঘাটের ডিঙা বাই ।

ভাদর আসে মরা গাঙে ভরা বন্যা নিয়ে—
রাঙা জলে এপার ওপার একসা ক'রে দিয়ে ;
লগির গোড়া পায় না তলা, মিলে না আর থই,
দিনে রাতে তবু আমার কাজের ছুটি কই ।

হঠাৎ যেদিন বানের জলে ছাপিয়ে উঠে মাঠ,
হাঁটু-নাগাল ধানের জমি, গলা-নাগাল পাট,
কানাকানি বানের জলে ধানের আগা দোলে,
টল্‌মলিয়ে ডিঙা আমার চলে তারি কোলে ।

কোথায় বা সে আলের রেখা, কোথায় বা সে বাঁধ,
বাবলা গাছের বেড়া নিয়ে কোথায় বা বিবাদ।
বাঁধনহারা বানের মুখে বিধি-বিধান নাই—
সীমাবিহীন সাঁতার খেতে ঘাটের ডিঙা বাই।

কোমর-জলে দাঁড়িয়ে ক'ষে কাস্তে চালায় চাষী,
ধানের শিষের সোঁদা গন্ধ হাওয়ায় বেড়ায় ভাসি',
কাজল-কটা ধানের ডগা নুইয়ে জলের তলে
মস্‌মসিয়ে তারি মাঝে ডিঙা আমার চলে।

আঁটি-বাঁধা ধানের রাশি এপার-ওপার করি,
পালা-বাঁধা পাটের গাদা বোঝাই ক'রে মরি;
দিনে-রাতে কত লোকের কত কথাই শুনি—
আমি বসে আপন মনে খেয়ার হিসাব গুনি।

জলের গায়ে সিঁদুর ঢেলে সূয্যি উঠে পূবে,
দিনের খেয়া সেরে আবার পশ্চিমেতে ডুবে;
বারো মাসে একটি দিনও ছুটি-কামাই নাই,
তারি সাথে আমি আমার ঘাটের ডিঙা বাই।

আমরা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে— বরদ বঙ্গে ;—
বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুক-মালা,
ভালে কাঞ্চনশৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
কোল-ভরা যার কনক ধান্য, বুক-ভরা যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী-অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গভঙ্গে,—
আমরা বাঙালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি ,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।
আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে,
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়।
এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।

জ্ঞানের নিধান আদিবিদ্বান্ কপিল সাংখ্যকার
এই বাংলার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক-হার।

বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ংকর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপংকর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি'
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি'।
বাংলার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদে।

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরভূধরে'র ভিত্তি,
শ্যাম-কাম্বোজে 'ওংকারধাম',—মোদেরি প্রাচীন কীর্তি।
ধেয়ানের ধনে মূর্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বিট্‌পাল আর ধীমান্,— যাদের নাম অবিনশ্বর।
আমাদেরি কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তূলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজন্তায়।
কীর্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি'
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।

মন্বন্তরে মরি নি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিসে অমৃতের টিকা পরি'।
দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদেরি এই কুটীরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি ;
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালীর-হিয়া-অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,—
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।

তপের প্রভাবে বাঙালী সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাধনার বাড়া ;
বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালী দিয়েছে বিয়া,
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।
বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙালী-জনম, বিফল নহে এ প্রাণ।
ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা-ভরা আহ্লাদে,
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙালী ধাতার আশীর্বাদে।

শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী,
তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের শতকোটি।
অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙালীর গৌরবে।
প্রতিভায় তপে সে ঘটনা হবে, লাগিবে না তার বেশী,
লাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা জাগিবে না দ্বেষাদ্বেষি ;
মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি' ধীরে—
মুক্ত হইব দেব-ঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে।

উদ্যানে

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

চৌদিকে আজ ফুল ফুটেছে
যেথায় ফিরাই দৃষ্টি,
আজকে আমায় জানিয়ে দিলে
রূপ যে কেমন মিষ্টি।
লাবণ্য আজ উথলে উঠে
ধরতে নারে পত্রপুটে,
চতুর্দিকে হয় যে প্রাণে
সুধার ধারা বৃষ্টি।

ভবিষ্যতের আনন্দ ওই
ঘুমায় রূপের অঙ্কে,
বংশধরের জনম যেন
জানায় অযুত শঙ্খে।
উঠল আজি আদিম রবি
লোহিত জবার আলোক ছবি,
আশায় ভরা ত্বরায় হবে
নূতন ধরার সৃষ্টি॥

ছাত্রধারা

কালিদাস রায়

বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যামঠতলে
চলে যায় তারা কলরবে,
কৈশোরের কিশলয় পর্ণে পরিণত হয়
যৌবনের শ্যামল গৌরবে।

ভালোবাসি, কাছে ডাকি, নামও সব জেনে রাখি,
দেখাশোনা হয় নিতি নিতি,
শাসন তর্জন করি' শিখাই প্রহর ধরি',
থাকে নাকো, হায়, কোনো স্মৃতি।

ক দিনের এই দেখা— সাগরসৈকতে রেখা
নূতন তরঙ্গে মুছে যায়।
ছোট ছোট দাগ পা'র ঘুচে হয় একাকার,
নব নব পদ-তাড়নায়।

জানে না কে কোথা যাবে, জোটে হেথা, নাহি ভাবে,
পাঠশালা,— যেন পান্থশালা,
দু দিন একত্রে মাতে মেলে মেশে, ব'সে গাঁথে
নীতি-হার, আর কথা-মালা।

রাজপথে দেখা হলে কেহ যদি গুরু ব'লে
হাত তুলে করে নমস্কার,
বলি তবে হাসিমুখে— "বেঁচে বর্তে থাকো সুখে,"
স্পর্শ করি' কেশগুলি তার।

ভাবিতে ভাবিতে যাই— কি নাম ? মনে তো নাই,
ছাত্র ছিল কতদিন আগে ;
স্মৃতিসূত্র ধরি' টানি, কৈশোরের মুখখানি
দেখি মনে জাগে কি না জাগে।

ঘন ঘন আনাগোনা কতদিন দেখাশোনা,
তবু কেন মনে নাহি থাকে ?
'ব্যক্তি' ডুবে যায় 'দলে', মালিকা পরিলে গলে
প্রতি ফুলে কে বা মনে রাখে ?

এ জীবনে ভেঙে গ'ড়ে শ্যামল সরস ক'রে
ছাত্রধারা ব'য়ে চলে যায়,
ফেনিলতা উচ্ছলতা হয়ে যায় তুচ্ছ কথা,
উত্তালতা সকলি মিলায়।

স্বচ্ছতায় শুধু হেরি আমার জীবন ঘেরি'
ভাসে শুধু ম্লান মুখগুলি ;
ভুলে যাই হট্টগোল অট্টহাসি কলরোল,
ম্লান মুখ কখনো না ভুলি।

কেহ বা ক্ষুধায় ম্লান, কেহ রোগে ম্রিয়মাণ,
শ্রমে কারো চাহনি করুণ,
কেহ বা বেত্রের ডরে বন্দী হয়ে রয় ঘরে,
নেত্র কারো তন্দ্রায় অরুণ।

কেহ বাতায়ন-পাশে চেয়ে রয় নীলাকাশে
যেন বদ্ধ পিঞ্জরের পাখী,
আকাশে হেরিয়া ঘুড়ি মন তার যায় উড়ি,
মুখে কালো ছায়াখানি রাখি'।

স্মরিয়া খেলার মাঠ কেউ ভুলে যায় পাঠ,
বুদ্ধিতে বা কারো না কুলায়,
কেহ স্মরে গেহ-কোণ, স্নেহময় ভাইবোন—
ঘড়ি-পানে ঘন ঘন চায়।

ডাকিছে উদার বায়ু লয়ে স্বাস্থ্য লয়ে আয়ু,
ডাক শোনে ব'সে রুদ্ধ ঘরে,
হাতে মসী মুখে মসী, মেঘে ঢাকা শিশু-শশী—
প্রতিবিম্বে মোর স্মৃতি ভরে।

আর সবি গেছি ভুলি', ভুলি নি এ মুখগুলি,
একবার মুদিলে নয়ন
আঁখিপাতা ভারী-ভারী, ম্লান মুখ সারি সারি
আকুল করিয়া তোলে মন।

কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার॥

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!
যুগযুগান্ত-সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদেরে পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার॥

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃ-মুক্তি-পণ!
"হিন্দু না ওরা মুস্‌লিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র॥

গিরি-সংকট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?
ক'রে হানাহানি, তবু চলো টানি' নিয়াছ যে মহাভার॥

কাণ্ডারী ! তব সম্মুখে ঐ পলাশির প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর !
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর !
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার ॥

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান ?
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী, হুঁশিয়ার ॥

গদ্যাংশ

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

প্রস্থানসময় উপস্থিত হইল। গৌতমী, এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামে দুই শিষ্য, শকুন্তলার সমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত, প্রস্তুত হইলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা যথাসম্ভব, বেশভূষায় সমাধান করিয়া দিলেন। মহর্ষি, শোকাকুল হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অদ্য শকুন্তলা যাইবেক বলিয়া, আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে; নয়ন অনবরত বাষ্পবারিতে পরিপূরিত হইতেছে; কণ্ঠরোধ হইয়া, বাক্‌শক্তিরহিত হইতেছি; জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চর্য! আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈক্লব্য উপস্থিত হইতেছে; না জানি, সংসারীরা, এমন অবস্থায়, কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম, স্নেহ অতি বিষম বস্তু। অনন্তর, তিনি, শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে! বেলা হইতেছে, প্রস্থান কর; আর অনর্থক কালহরণ করিতেছ কেন? এই বলিয়া, তপোবনতরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি, তোমাদের জলসেচন না করিয়া, কদাচ জলপান করিতেন না; যিনি, ভূষণপ্রিয়া হইয়াও, স্নেহবশতঃ, কদাচ তোমাদের পল্লবভঙ্গ করিতেন না; তোমাদের কুসুমপ্রসবের সময় উপস্থিত হইলে, যাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না; অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে অনুমোদন কর।

অনন্তর, সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। শকুন্তলা, গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া, প্রিয়ংবদার নিকটে গিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিলেন,

সখি! আর্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত, আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছে বটে; কিন্তু, তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে, আমার পা উঠিতেছে না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! তুমিই যে কেবল তপোবন-বিরহে কাতর হইতেছ, এরূপ নহে, তোমার বিরহে, তপোবনের কি অবস্থা ঘটিতেছে, দেখ!—জীবমাত্রেই নিরানন্দ ও শোকাকুল; হরিণগণ, আহারবিহারে পরাঙ্‌মুখ হইয়া, স্থির হইয়া রহিয়াছে, মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে; ময়ূর ময়ূরী, নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া, উর্ধ্বমুখ হইয়া রহিয়াছে; কোকিলগণ, আম্রমুকুলের রসাস্বাদে বিমুখ হইয়া, নীরব হইয়া আছে; মধুকর মধুকরী মধুপানে বিরত হইয়াছে, ও গুন্‌ গুন্‌ ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে।

কণ্ব কহিলেন, বৎসে! আর কেন বিলম্ব কর, বেলা হয়। তখন শকুন্তলা কহিলেন, তাত! বনতোষিণীকে সম্ভাষণ না করিয়া, যাইব না। এই বলিয়া, তিনি বনতোষিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন, বনতোষিণি! শাখাবাহু দ্বারা, আমায় স্নেহভরে আলিঙ্গন কর; আজ অবধি আমি দূরবর্তিনী হইলাম। অনন্তর, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, সখি! আমি বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম। তাঁহারা কহিলেন, সখি! আমাদিগকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিলে, বল? এই বলিয়া, উভয়ে শোকাকুল হইয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমরা কি পাগল হইলে? তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করিবে, না হইয়া, তোমরাই রোদন করিতে আরম্ভ করিলে।

এক পূর্ণগর্ভা হরিণী কুটীরের প্রান্তে শয়ন করিয়া ছিল। তাহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে, শকুন্তলা কণ্বকে কহিলেন, তাত! এই হরিণী নির্বিঘ্নে প্রসব হইলে, আমায় সংবাদ দিবে, ভুলিবে না বল? কণ্ব কহিলেন, না বৎসে! আমি কখনই ভুলিব না।

কতিপয় পদ গমন করিয়া, শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানিতেছে, এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কণ্ব কহিলেন, বৎসে! যাহার মাতৃবিয়োগ হইলে, তুমি জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলে; যাহার আহারের নিমিত্ত, তুমি সর্বদা শ্যামাক আহরণ করিতে; যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ দ্বারা ক্ষত হইলে, তুমি ইঙ্গুদীতৈল দিয়া ব্রণশোষণ করিয়া দিতে; সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার গতিরোধ করিতেছে। শকুন্তলা তাহার গাত্রে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন, বাছা! আর আমার সঙ্গে আইস কেন, ফিরিয়া যাও; আমি তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। তুমি মাতৃহীন হইলে, আমি তোমায় প্রতিপালন করিয়াছিলাম; এখন আমি চলিলাম; অতঃপর, পিতা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। এই বলিয়া, শকুন্তলা রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, বৎসে! শান্ত হও, অশ্রুবেগের সংবরণ কর, পথ দেখিয়া চল; উচ্চ নীচ না দেখিয়া পদক্ষেপ করাতে, বারংবার আঘাত লাগিতেছে।

এইরূপ নানা কারণে গমনে বিলম্ব দেখিয়া, শার্ঙ্গরব কণ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনকার আর অধিক দূর সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই; এই স্থলেই, যাহা বলিতে হয়, বলিয়া দিয়া, প্রতিগমন করুন। কণ্ব কহিলেন, তবে আইস, এই ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান হই। তদনুসারে, সকলে সন্নিহিত ক্ষীরপাদপের ছায়ায় অবস্থিত হইলে, কণ্ব, কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া, শার্ঙ্গরবকে কহিলেন, বৎস! তুমি, শকুন্তলাকে রাজার সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহারে আমার এই আবেদন জানাইবে— আমরা বনবাসী, তপস্যায় কালযাপন করি; তুমি অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; আর, শকুন্তলা, বন্ধুবর্গের অগোচরে, স্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে অনুরাগিণী হইয়াছে; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া,

অন্যান্য সহধর্মিণীর ন্যায়, শকুন্তলাতেও স্নেহদৃষ্টি রাখিবে; আমাদের এই পর্যন্ত প্রার্থনা; ইহার অধিক ভাগ্যে থাকে ঘটিবেক, তাহা আমাদের বলিয়া দিবার নয়।

মহর্ষি, শার্ঙ্গরবের প্রতি এই সন্দেশ নির্দেশ করিয়া, শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! এক্ষণে তোমারেও কিছু উপদেশ দিব। আমরা বনবাসী বটে, কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। তুমি, পতিগৃহে গিয়া, গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে; সপত্নী-দিগের সহিত প্রিয়সখীব্যবহার করিবে; পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে; সৌভাগ্যগর্বে গর্বিত হইবে না; স্বামী কার্কশ্যপ্রদর্শন করিলেও, রোষবশা ও প্রতিকূলচারিণী হইবে না; মহিলারা, এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই, গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হয়; বিপরীত-কারিণীরা কুলের কণ্টকস্বরূপ। ইহা কহিয়া, বলিলেন, দেখ, গৌতমীই বা কি বলেন? গৌতমী কহিলেন, বধূদিগকে এই বই আর কি বলিয়া দিতে হইবেক? পরে শকুন্তলাকে কহিলেন, বাছা! উনি যেগুলি বলিলেন, সকল মনে রাখিও।

এইরূপে উপদেশদান সমাপ্ত হইলে, কণ্ব শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে! আমরা আর অধিক দূর যাইব না; আমাকে ও সখীদিগকে আলিঙ্গন কর। শকুন্তলা অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাও কি এইখান হইতে ফিরিয়া যাইবেক? ইহারা সে পর্যন্ত আমার সঙ্গে যাউক। কণ্ব কহিলেন, না বৎসে! ইহাদের বিবাহ হয় নাই; অতএব, সে পর্যন্ত যাওয়া ভাল দেখায় না; গৌতমী তোমার সঙ্গে যাইবেন। শকুন্তলা, পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া, গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, তাত! তোমায় না দেখিয়া, সেখানে কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব? এই বলিতে বলিতে, তাঁহার দুই চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। তখন কণ্ব

অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, বৎসে! এত কাতর হইতেছ কেন? তুমি, পতিগৃহে গিয়া, গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সাংসারিক ব্যাপারে অনুক্ষণ এরূপ ব্যস্ত থাকিবে যে, আমার বিরহজনিত শোক অনুভব করিবার অবকাশ পাইবে না। শকুন্তলা পিতার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, তাত! আবার, কত দিনে, এই তপোবনে আসিব? কণ্ব কহিলেন, বৎসে! সসাগরা ধরিত্রীর একাধিপতির মহিষী হইয়া, এবং অপ্রতিহত-প্রভাব স্বীয় তনয়কে সিংহাসনে সন্নিবেশিত, ও তদীয় হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পিত দেখিয়া, পতিসমভিব্যাহারে, পুনরায়, এই শান্তরসাস্পদ তপোবনে আসিবে।

শকুন্তলাকে এইরূপ শোকাকুলা দেখিয়া, গৌতমী কহিলেন, বাছা! আর কেন, ক্ষান্ত হও, যাইবার বেলা বহিয়া যায়; সখীদিগকে যাহা বলিতে হয়, বলিয়া লও; আর বিলম্ব করা হয় না। তখন শকুন্তলা সখীদের নিকটে গিয়া কহিলেন, সখি! তোমরা উভয়ে এক কালে আলিঙ্গন কর। উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন। তিন জনেই রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, সখীরা শকুন্তলাকে কহিলেন, সখি! যদি রাজা শীঘ্র চিনিতে না পারেন, তাঁহাকে তদীয় স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও। শকুন্তলা, শুনিয়া, অতিশয় শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, সখি! তোমরা এমন কথা বলিলে কেন, বল? তোমাদের কথা শুনিয়া, আমার হৃৎকম্প হইতেছে। সখীরা কহিলেন, না সখি! ভীত হইও না; স্নেহের স্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে।

এই রূপে, ক্রমে ক্রমে, সকলের নিকট বিদায় লইয়া, শকুন্তলা, গৌতমী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে, দুষ্যন্তরাজধানী উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। কণ্ব, অনসূয়া, ও প্রিয়ংবদা, একদৃষ্টিতে শকুন্তলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে, শকুন্তলা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা

উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমাদের সহচরী দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছেন; এক্ষণে, শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, আমার সহিত আশ্রমে প্রতিগমন কর। এই বলিয়া, মহর্ষি আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, এবং তাঁহারাও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। যাইতে যাইতে, মহর্ষি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যেমন, স্থাপিত ধন ধনস্বামীর হস্তে প্রত্যর্পিত হইলে, লোক নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হয়; তদ্রূপ, অদ্য আমি, শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া, নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ, হইলাম।

স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন

অক্ষয়কুমার দত্ত

একত্র সমাজ-বদ্ধ হইয়া বাস করা যেমন মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম, এমন আর কোন জন্তুর নহে। যদিও অন্যান্য প্রাণীরও এ প্রকার স্বভাব দৃষ্টি করা যায় যে, তাহারা দল-বদ্ধ হইয়া একত্র অবস্থান ও একত্র গমনাগমন করিতে ভালবাসে, কিন্তু মনুষ্য যেরূপ সকল বিষয়ে পরস্পর-সাপেক্ষ, অন্য কোন প্রাণী সেরূপ নহে। আমাদিগকে সকল বিষয়েই অন্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। অন্ন, বস্ত্র, বিদ্যা প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের আবশ্যক, তাহাই অন্যের যত্নসাধ্য ও অন্যের সাহায্য-সাপেক্ষ। এমন কি, যে দেশে বা যে জনপদে বাস করা যায়, তত্রত্য লোকে যে পরিমাণে কর্ম্মদক্ষ, জ্ঞানাপন্ন, ও ধর্ম্মশীল হয়, সেই পরিমাণে আমাদের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে থাকে। কৃষকেরা কৃষিবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া উত্তমরূপ শস্য, ফল, মূলাদি উৎপাদন করিতে না পারিলে, আমরা

তাহা প্রাপ্ত হইতে পারি না। শিল্পকারেরা শিল্পকার্যে সুদক্ষ হইয়া সুখসম্ভোগের উপযোগী উত্তমোত্তম সামগ্রী প্রস্তুত করিতে না পারিলে, এবং নাবিক ও বণিক্‌গণ স্ব স্ব ব্যবসায়ে পারদর্শী হইয়া নানাদেশীয় দ্রব্যজাত আনয়ন করিতে পারগ না হইলে, আমরা সে সমস্ত সম্ভোগ করিতে সমর্থ হই না। স্বদেশে উত্তমোত্তম বিদ্যালয় সংস্থাপিত ও উত্তমোত্তম গ্রন্থ প্রচলিত না থাকিলে, উৎকৃষ্টরূপ বিদ্যাশিক্ষার সম্ভাবনা থাকে না। স্বদেশীয় সর্বসাধারণ লোকে নানাপ্রকার কুসংস্কার-পাশে বদ্ধ থাকিলে, তাহাদের সহবাসে থাকিয়া যথার্থ ধর্ম প্রতিপালন করা দুরূহ হইয়া উঠে। যদি কোন জ্ঞানাপন্ন ধর্মশীল ব্যক্তি অধার্মিক মূর্খ লোকের সহিত নিরন্তর একত্র বাস করেন, তাহা হইলে কোন ক্রমেই সর্বতোভাবে সুখী হইতে পারেন না। তিনি আত্ম-সদৃশ, সদ্বিদ্যাশালী, ধামিক লোকের প্রতিবাসী হইলে, যে প্রকার পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারেন, অজ্ঞানী অধার্মিক লোকে পরিবেষ্টিত থাকিলে, কোন মতেই সেরূপ সুখসম্ভোগ করিতে সমর্থ হন না।

অতএব, জনসমাজে অবস্থিতিপূর্বক অপর সাধারণের বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ের উন্নতিসাধনার্থ চেষ্টা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। ইতর জন্তুর ন্যায় কেবল আত্মোদর ও আত্মপরিবারের ভরণ-পোষণ করিয়া ক্ষান্ত থাকা মনুষ্যের ধর্ম নয়। প্রতি দিবস আপন আপন নিত্যকর্ম সমাপন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ কাল যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনার্থে ক্ষেপণ করা কর্তব্য। যাহাতে স্বদেশীয় লোকের জ্ঞান, ধর্ম, সুখ ও স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়, কুরীতি সকল রহিত হইয়া সুরীতি সমুদায় সংস্থাপিত হয়, এবং রাজনিয়ম সংশোধিত ও সত্যধর্ম প্রচারিত হয়, তদর্থে চেষ্টিত হওয়া উচিত। স্বীয় পরিবার প্রতি-পালনের ন্যায় স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদনার্থে যত্ন, পরিশ্রম, ও বুদ্ধি

পরিচালন করাও যে মনুষ্যের অবশ্য-কর্তব্য কর্ম, ইহা অনেকেই বিবেচনা করেন না। তাঁহারা ইতর প্রাণীর ন্যায় কেবল লোভ কামাদি রিপু সমুদায়কে চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই সর্বদা ব্যস্ত। পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বর ভূমণ্ডলস্থ অন্যান্য সমস্ত জন্তু অপেক্ষা মনুষ্যকে যে বিশিষ্টরূপ শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, তাহার মত কি কার্য করিতেছি, ইহা সকলেরই এক একবার চিন্তা করা উচিত। ক্রমে ক্রমে সর্বসাধারণের মঙ্গলোন্নতি হয়, ইহাই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, এবং ইহাই তাঁহার সমুদয় নিয়মের উদ্দেশ্য। এই পরম মনোহর উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করা সকলেরই পক্ষে বিধেয়। আপন আপন জীবিকা-নির্বাহের উপায় চিন্তা করা যেরূপ আবশ্যক, সময়ে সময়ে একত্র সমাগত হইয়া স্বদেশের দুঃখ-বিমোচন ও সুখ-সম্পাদনার্থ যত্ন ও চেষ্টা করাও সেইরূপ আবশ্যক।

সন্তানের শিক্ষা

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

কথায় বলে ছেলেকে মানুষ করিতে হয়। আমার বোধ হয়, ঐ কাজটি কোন পিতা-মাতার সাধ্যায়ত্ত নয়, এবং কেহ তজ্জন্য চেষ্টাও করে না। ইংরাজ আপনার ছেলেকে ইংরাজ করিবারই চেষ্টা করেন, এবং তাহাই করিতে পারেন। চীনীয় আপন সন্তানকে চীনীয় করিবার নিমিত্তই যত্ন করেন, এবং তাহাই করিয়া থাকেন। এইরূপ বিভিন্ন-জাতীয় লোকেরা আপনাপন জাতির বিশেষ ধর্ম এবং গুণের দ্বারাই স্বীয় বংশধরদিগকে বিভূষিত করিতে চাহেন— কেহই মনুষ্যসাধারণ ধর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সন্তানের পালন এবং শিক্ষাসম্পাদন করেন না।

তবে যে সাধারণ মনুষ্য-ধর্মগুলি সকল জাতিতেই বিদ্যমান আছে, জাত্যনুযায়িনী শিক্ষা প্রদান করিতে করিতে সেই সকল ধর্ম সর্বজাতীয় মনুষ্যশিশুরই শিক্ষা হইয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই।

অতএব সকল দেশেরই শিক্ষা-প্রণালী মনুষ্যসাধারণ ধর্মের প্রতি লক্ষ না করিয়া জাতীয় ধর্ম-সাধনের উদ্দেশেই প্রবাহিত হইয়া থাকে। ফলকথা, তাহাই হইতে পারে, এবং তাহাই হওয়া উচিত।

তাহাই হইতে পারে এই জন্য যে, মনুষ্য মাত্রেরই মন পূর্বপুরুষদিগের সংস্কার এবং আপনাদিগের প্রত্যক্ষীভূত ব্যাপার সমস্তের সমবায়ে সংগঠিত হয়; সংস্কার, সজাতীয় পূর্বপুরুষদিগের হইতে আইসে; প্রত্যক্ষীভূত ব্যাপারের সমধিক ভাবও সজাতীয় জনগণের কার্যকলাপ। এই জন্য জাতীয় ভাব পরিহার করা মানবের অসাধ্য। বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করিয়া যেমন উড্ডয়ন হয় না— জল ছাড়িয়া যেমন সন্তরণ সম্ভবে না— ত্বক্‌সীমার বহির্ভাগে যেমন স্পর্শজ্ঞান হইতে পারে না— তেমনি জাতীয়ভাবপরিশূন্য হইয়া কোন ব্যাপারের অনুষ্ঠানও মনুষ্যকর্তৃক সাধিত হইতে পারে না।

তদ্ভিন্ন, সমাজের হিতাহিত লইয়াই সমাজান্তর্গত মনুজগণের হিতাহিত। সকল সময়ে, সকল দেশে, সকল অবস্থায়, সকল সমাজের হিতাহিত এক নয়। বর্বর, অর্ধসভ্য, পূর্ণসভ্য প্রভৃতি বিভিন্ন সমাজের হিতাহিত অনেকাংশেই পরস্পর বিভিন্ন। বিজিত এবং বিজেতা, দুর্বল এবং সবল, দৃঢ় এবং শিথিল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সমাজের হিতাহিতও এক নয়। অভ্যুদয়োন্মুখ এবং পতনপ্রবণ জাতির হিতাহিতও এক নয়। সুতরাং সমাজের প্রয়োজন-সাধনোপযোগী অনুষ্ঠানও ভিন্নরূপ হওয়া আবশ্যক।

সমাজের প্রয়োজন-সাধনোপযোগী অনুষ্ঠানই প্রকৃত শিক্ষার বিষয়।

এই ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই আমাদিগের শিক্ষা-প্রণালী সংস্থাপিত হয়, ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ। আমরা বাঙ্গালী— আমাদিগের সমাজ যে ভাবাপন্ন তাহাতে আমাদিগের প্রয়োজন কি? এইটি সুপরিস্ফুটরূপে অবধারিত করিয়া আমাদিগের পরবর্তী পুরুষেরা যাহাতে ঐ সকল প্রয়োজন-সাধনে সক্ষম হয়, তাহার উপায় করিয়া দেওয়াই আমাদিগের প্রকৃত শিক্ষা দান। মনুষ্যত্বসাধন মস্ত কথা। মনুষ্যত্ব যে কি এবং উহা যে কি নয়, বা কি হইতে পারে না, তাহা এ পর্যন্ত বোধ হয় কেহই স্পষ্টরূপে বুঝিতে এবং বলিতে পারেন নাই। অতএব কিরূপ হইলে ছেলেটি প্রকৃত মনুষ্য হইবে, তাহা না ভাবিতে গিয়া কিরূপ হইলে ছেলেটি সমাজের অভাব-মোচনে সাহায্য করিতে পারিবে, তাহাই চিন্তা করা আবশ্যক। আমি তাদৃশ চিন্তাসম্ভূত কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিব।

(১) স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালী দুর্বলশরীর অতএব ছেলের শরীর সবল করিবার নিমিত্ত যত্ন করা আমাদিগের আবশ্যক। শৈশবাবধি ব্যায়ামচর্চায় মনোনিবেশ করিয়া দেওয়া পিতা-মাতার কার্য।

(২) বাঙ্গালীর ইন্দ্রিয়গ্রাম যদিও স্বভাবতঃ কোন জাতীয় লোকের অপেক্ষা হীনতেজ নয়, তথাপি শিক্ষার অভাবে ইন্দ্রিয়গণ বহুস্থলে প্রকৃত বিষয়ের উপলব্ধিতে অক্ষম হইয়া থাকে। দর্শনাদি দ্বারা দূরতা, নৈকট্য, সংখ্যা, ভাব প্রভৃতির অববোধ বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রায়ই ঠিক হয় না। অতএব বাল্যাবধি ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা পিতা-মাতার কার্য।

(৩) বাঙ্গালীর স্মৃতিশক্তি অতীব প্রখরা। যাঁহারা বাঙ্গালীর নিন্দা করেন, তাঁহারাও ঐ কথা স্বীকার করেন; কিন্তু বলেন, ইহাদের ধীশক্তি এবং উদ্ভাবনী শক্তি তেমন অধিক নয়। নিন্দকদিগের সহিত বিচারে প্রয়োজন নাই। এই মাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে, স্মৃতি

একটি স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি নহে। মনোবৃত্তি মাত্রেরই কারণ-শক্তির নাম স্মৃতি— অর্থাৎ স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়াই সকল মনোবৃত্তি কার্যকারিণী হয়। সুতরাং স্মৃতিকে প্রখরা বলিলে মনোবৃত্তি মাত্রেই তেজস্বিনী বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু বাঙ্গালীর মনোবৃত্তি তেজস্বিনী বলিয়াই শিক্ষার একটি দোষ জন্মে। ভাব সমস্ত সুপরিস্ফুট না হইলেও বাঙ্গালীর মন সেগুলি গ্রহণ করিয়া রাখে— একেবারে পরিত্যাগ করে না; তাহাতে কার্যকালে ক্ষতি হয়, এবং কৃতিসামর্থ্যও ন্যূন হইয়া পড়ে। এই জন্য বাঙ্গালীর ছেলেকে শিখাইবার সময় যাহাতে ভাব সমস্ত সুপরিস্ফুট হয়, তজ্জন্য কি শিক্ষক, কি পিতা মাতা, সকলেরই যত্ন করা বিধেয়।

(৪) অন্যান্য মনোবৃত্তি যেমন প্রবলা, বাঙ্গালীর দূরদর্শিতা এবং কল্পনাশক্তিও তদনুরূপ। তদ্ভিন্ন, শরীরের দৌর্বল্য-নিবন্ধন অনেক বাঙ্গালী ভীরুস্বভাব। এই দুই এবং অন্যান্য কারণে বাঙ্গালীর ছেলের অনৃতবাদিতা দোষ জন্মিতে পারে। যাহাতে তাদৃশ দোষ না জন্মে, তজ্জন্য পিতা-মাতার সর্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যক। দূরদর্শিতা বর্ধিত করিয়াই অনৃতবাদিতার শাসন করা বিধেয়। সত্যই টেঁকে, মিথ্যা কখন টেঁকে না, এই তথ্যটি সর্বদা সন্তানের মনে জাগরূক রাখা আবশ্যক।

(৫) বাঙ্গালী প্রবলতর জাতীয়দিগের পদমর্দিত হইয়া ক্ষুদ্রাশয় হইয়া যাইতেছে। অতএব আশার বৈফল্য বশতঃ সন্তানের ভবিষ্যতে যতই ক্লেশ হউক, পিতা-মাতার কর্তব্য তাহাকে উচ্চাশয়সম্পন্ন করেন। যেমন সান্নিপাতিক বিকার-প্রাপ্ত রোগীর পক্ষে ধাতু-উত্তেজক ঔষধের প্রয়োগ বিধেয়, তেমনি বাঙ্গালীর মনে উচ্চ আশার উদ্রেক করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। "দুবেলা দুমুটা খেতে পেলেই" হইল, এবংবিধ বাক্য সন্তানের কর্ণগোচর হইতে দিতে নাই।

(৬) বঙ্গদেশের বায়ু সজল এবং উষ্ণ; বাঙ্গালীর শরীরও দুর্বল,

বাঙ্গালী সহজেই শ্রম-বিমুখ। অতএব সন্তান যাহাতে শ্রমশীল হয়, তজ্জন্য পিতা-মাতাকে নিরন্তর সচেষ্ট থাকিতে হইবে। যে সকল বাঙ্গালী শ্রমশীল, তাঁহাদিগেরও পরিশ্রম দোষশূন্য নয়; একবার খুব পরিশ্রম করা হয়, আবার কিছুই থাকে না। এরূপ অনিয়মে দুর্বল শরীর আরও ভাঙ্গিয়া যায়। ছেলেকে ওরূপ করিতে দিতে নাই। যেরূপ পরিশ্রম সয় বয়, সেইরূপ নিয়মিত পরিশ্রম অভ্যাস করাইতে হইবে।

(৭) এক্ষণকার বাঙ্গালী নিস্তেজ। নিস্তেজ হইয়া পড়িলেই পরস্পর পরস্পরকে ঈর্ষ্যা করিয়া থাকে। ঈর্ষ্যা দোষটি সত্বর যাইবার নয়; তবে উহার বাগ ফিরাইতে পারা যায়। অতএব ঐ ঈর্ষ্যা যাহাতে সজাতীয়ের প্রতি না জন্মে, অন্য জাতীয়ের সহিত "প্রতিযোগিতা"য় পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক।

(৮) বাঙ্গালীর স্বভাবে অনুচিকীর্ষা-বৃত্তি অযথারূপে প্রবলা হইয়া উঠিয়াছে। অনুকরণ উৎকর্ষসাধনের একটি প্রধান পথ সন্দেহ নাই। কিন্তু অযথা অনুকরণে এক প্রকার আত্মহত্যার সংঘটন হয়। অতএব বাঙ্গালীর অন্তঃকরণে আত্মগৌরব সংবর্ধিত করিবার উপায় করা আবশ্যক। পূর্বপুরুষগণের কীর্তি-স্মরণে আত্মগৌরব উদ্দীপিত হইয়া থাকে। এই হেতু বাঙ্গালীর ছেলেকে সংস্কৃত বিদ্যার স্বাদগ্রহণ করাইবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ হয়। যখন ছেলে ইংরাজী পড়িবে, তখন ইংরাজী গ্রন্থে কোন উৎকৃষ্ট ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলে, তাহার অনুরূপ অথবা তাহা হইতেও উৎকৃষ্টতর ভাব যে সংস্কৃত শাস্ত্রে আছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

(৯) বাঙ্গালীর সহানুভূতি নিজ সমাজের মধ্যে তেমন অধিক হয় না। বাঙ্গালী আর বাঙ্গালীর প্রশংসায় যথোচিত পরিতৃপ্ত অথবা বাঙ্গালীর তিরস্কারে তাদৃশ ক্লিষ্ট হইতেছে না। ইংরাজের প্রশংসা এবং

ইংরাজের নিন্দাই বাঙ্গালীকে যেন বেশী লাগে। এটি সাংঘাতিক দোষ। ইহার প্রতিবিধানের উপায় কিছুই অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। তবে বোধ হয়, ছেলেকে বাঙ্গালা ভাষার চর্চায় কিয়ৎপরিমাণে প্রবর্তিত করা অর্থাৎ কিছু কিছু বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করিতে দেওয়া এবং যাহাদিগের লিখিবার ক্ষমতা জন্মে, তাহাদিগকে বাঙ্গালা প্রবন্ধাদি লিখিতে দেওয়া ভাল।

(১০) দরিদ্রের পক্ষে বিলাসিতা বড় সাংঘাতিক রোগ। আমরা এক্ষণে দরিদ্র জাতি। আমাদিগের সুখোপভোগ-চেষ্টা ভাল নয়। গান বাজনা, আমোদ প্রমোদ, বিজয়ী ধনশালী প্রবলপ্রতাপ ইংরাজদিগকে সাজে; আমাদিগের মধ্যে গান তামাসা নাটকাভিনয়াদি কাণ্ড কোন মতেই শোভা পায় না। অতএব সন্তানকে বিলাসী হইতে দিতে নাই। যিনি আমাদিগের মধ্যে ধনবান্ তাঁহারও কর্তব্য, ছেলেকে বাবুয়ানা হইতে নিবারণ করিয়া রাখেন। সমাজের যে অবস্থা, তাহার অনুরূপ ব্যবহারই সমাজান্তর্গত সকল লোকের পক্ষে বিধেয়। বাঙ্গালীকে অনেক ভার সহ্য করিতে হইবে, অনেক চাপ ঠেলিয়া উঠিতে হইবে, সুতরাং বাঙ্গালীর শিক্ষা কঠোর হওয়াই আবশ্যক। প্রতি পরিবারের কর্তাকে এক একটি লাইকর্গস্ হইতে হইবে; কারণ বাঙ্গালীকে স্পার্টান করিবার নিমিত্ত রাজকীয় লাইকর্গস্ জন্মিবে না।

বশ্যতা-ব্যতিরেকে একতা জন্মিতে পারে না। একটি গল্প বলি। একখানি জাহাজে একজন অনভিজ্ঞ নূতন কাপ্তেন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কাপ্তেন অপেক্ষা সমধিক অভিজ্ঞ দুই চারি জন লোক তাঁহার অধীনে ছিল। একদিন কাপ্তেন জাহাজ চালাইতেছেন, এমন সময়ে তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিল, "জাহাজ যে বেগে যে পথ দিয়া যাইতেছে, তাহাতে আর এক ঘণ্টার মধ্যে একটি মগ্ন শিলায় আহত হইয়া বিনষ্ট হইবে।"

অপর একজন বলিল, "তবে এ কথা কাপ্তেনকে বল না কেন?" সে উত্তর করিল— "সে কি! কাপ্তেন আপনার কর্ম করিতেছেন— তাঁহার কথা শুনা মাত্র আমাদের কাজ, তিনি জিজ্ঞাসা না করিলে গায়ে পড়া হইয়া কি তাঁহাকে কিছু বলিতে আছে?" কেহ কিছু বলিল না। জাহাজ বিনষ্ট হইল। এরূপ বশ্যতা পাগলামি বটে— কিন্তু হিন্দুদিগের উন্নতিকালেও ঐরূপ পাগলামি ছিল; রামায়ণ ও মহাভারত-পাঠীদিগের তাহা অবিদিত নাই। যে দিনে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ওরূপ পাগলামি পুনর্বার জন্মিবে, সে দিন বাঙ্গালীর শুভ দিন।

বহুকাল হইতে বাঙ্গালীরা অসামরিক জাতি। এই জন্য বাঙ্গালীর মধ্যে প্রকৃত বশ্যতা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বলবানের নিকট দুর্বলের যে অধীনতা এবং নম্রতা, তাহাকে বশ্যতা বলা যায় না। বাঙ্গালী প্রায়ই বাঙ্গালীর বশ হইতে চায় না। অন্য জাতীয়ের বশ হয়, এবং তাহাই হইয়া আছে। বশ্যতা ভক্তিমূলক— ভক্তি শৈশবে শিক্ষণীয়, এবং পিতা মাতাই প্রথম হইতে ভক্তির আস্পদ হইয়া ঐ ভাবটিকে অঙ্কুরিত এবং সংবর্ধিত করিতে পারেন। যে বাঙ্গালী পিতা-মাতাকে ভয় ভক্তি করিতে শিখিয়াছে, সে বাঙ্গালী নেতারও বশীভূত হইতে পারিবে। যে বাঙ্গালী ছেলেবেলায় পিতা-মাতাকে মান্য করিতে শিখে নাই, সে দুই চারিখানি ইংরাজী বহি পড়িয়া বা লোকের মুখে দুই একটি ইংরাজী মতবাদ শুনিয়া বাবাকে মূর্খ জ্ঞান করিবে, এবং বাবার সজাতীয় বাঙ্গালী মাত্রকেই তাচ্ছিল্য করিয়া একটি প্রকাণ্ড বিচারু হইয়া উঠিবে।

দেশের শ্রীবৃদ্ধি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আজিকালি বড় গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এত কাল আমাদিগের দেশ উৎসন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরাজের শাসনকৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি। আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে।

কি মঙ্গল, দেখিতে পাইতেছ না? ঐ দেখ, লৌহবর্ত্মে লৌহতুরঙ্গ, কোটি উচ্চৈঃশ্রবাকে বলে অতিক্রম করিয়া, এক মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে। ঐ দেখ, ভাগীরথীর যে উত্তাল তরঙ্গমালায় দিগ্গজ ভাসিয়া গিয়াছিল, অগ্নিময়ী তরণী ক্রীড়াশীল হংসের ন্যায় তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া বাণিজ্যদ্রব্য বহিয়া ছুটিতেছে। কাশীধামে তোমার পিতার অদ্য প্রাতে সাংঘাতিক রোগ হইয়াছে— বিদ্যুৎ আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তোমাকে সংবাদ দিল, তুমি রাত্রিমধ্যে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলে। সে রোগ পূর্বে আরাম হইত না, এখন নবীন চিকিৎসাশাস্ত্রের গুণে ডাক্তারে তাহা আরাম করিল। যে ভূমিখণ্ড, নক্ষত্রময় আকাশের ন্যায় অট্টালিকাময় হইয়া এখন হাসিতেছে, আগে উহা ব্যাঘ্র-ভল্লুকের আবাস ছিল। ঐ যে দেখিতেছ রাজপথ, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ঐ স্থানে সন্ধ্যার পর, হয় কাদার পিছলে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া থাকিতে, না হয় দস্যুহস্তে প্রাণত্যাগ করিতে; এখন সেখানে গ্যাসের প্রভাবে কোটি চন্দ্র জ্বলিতেছে। তোমার রক্ষার জন্য পাহারা দাঁড়াইয়াছে, তোমাকে বহনের জন্য গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। যেখানে বসিয়া আছ, তাহা দেখ। যেখানে আগে ছেঁড়া কাঁথা, শপ ছিল, এখন

সেখানে কার্পেট, কৌচ, ঝাড়, কাণ্ডেলাব্রা, মারবেল, আলাবাস্টার,—কত বলিব? যে বাবু দূরবীন কষিয়া বৃহস্পতি-গ্রহের উপগ্রহগণের গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করিতেছেন, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে জন্মিলে উনি এত দিন চাল কলা ধূপ দীপ দিয়া বৃহস্পতির পূজা করিতেন। আর আমি যে হতভাগা, চেয়ারে বসিয়া ফুলিস্কেপ কাগজে বঙ্গদর্শনের জন্য সমাজতত্ত্ব লিখিতে বসিলাম, এক শত বৎসর পূর্বে হইলে আমি এতক্ষণ ধরাসনে পশুবিশেষের মত বসিয়া ছেঁড়া তুলট্ নাকের কাছে ধরিয়া নবমীতে লাউ খাইতে আছে কি না, সেই কচ্‌কচিতে মাথা ধরাইতাম। তবে কি দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে না? দেশের বড় মঙ্গল—তোমরা একবার মঙ্গলের জন্য জয়ধ্বনি কর।

এই মঙ্গল-ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাসিম শেখ, আর রামা কৈবর্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে, এক-হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণ-জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাথরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, লুন, লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় ভূমে, গোহালের একপাশে শয়ন করিবে— উহাদের মশা লাগে না। তাহারা পরদিন প্রাতে আবার সেই এক-হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে— যাইবার সময় হয় জমিদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয়তো চষিবার সময় জমিদার জমিখানি কাড়িয়া লইবেন,

তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস— সপরিবারে উপবাস। বল দেখি চশমা-নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদিগের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি, ইংরাজ-বাহাদুর! তুমি যে মেজের উপরে এক হাতে হংসপক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুগুচ্ছ কণ্ডূয়িত করিতেছ —তুমি বল দেখি যে, তোমা হইতে এই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তের কি উপকার হইয়াছে?

আমি বলি, অণুমাত্র না, কণামাত্রও না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না। দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয় জন? আর এই কৃষিজীবী কয় জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশের কয় জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ— দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কার্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।

দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, স্বীকার করি। আমরা এই প্রবন্ধে একটি উদাহরণের দ্বারা প্রথমে দেখাইব যে, দেশের কি প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পরে দেখাইব যে, কৃষকেরা সে শ্রীবৃদ্ধির ভাগী নহে। পরে দেখাইব যে, তাহা কাহার দোষ।

ব্রিটিশ অধিকারে রাজ্য সুশাসিত। পরজাতীয়েরা জনপদপীড়া উপস্থিত করিয়া যে দেশের অর্থাপহরণ করিবে, সে আশঙ্কা বহুকাল হইতে রহিত হইয়াছে। আবার স্বদেশীয়, স্বজাতীয়ের মধ্যে পরস্পরে যে সঞ্চিতার্থ অপহরণ করিবে, সে ভয়ও অনেক নিবারণ হইয়াছে।

দস্যুভীতি, চৌরভীতি, বলবৎকর্তৃক দুর্বলের সম্পত্তিহরণের ভয়, এ সকলের অনেক লাঘব হইয়াছে। আবার রাজা বা রাজপুরুষেরা প্রজার সঞ্চিতার্থ-সংগ্রহ-লালসায় যে বলে ছলে কৌশলে লোকের সর্বস্বাপহরণ করিবেন, সে দিনও নাই। অতএব যদি কেহ অর্থসঞ্চয়ের ইচ্ছা করে, তবে তাহার ভরসা হয় যে, সে তাহা ভোগ করিতে পারিবে, এবং তাহার উত্তরাধিকারীরাও তাহা ভোগ করিতে পারিবে। যেখানে লোকের এরূপ ভরসা থাকে, সেখানে লোকে সচরাচর সংসারী হয়। যেখানে পরিবার-প্রতিপালনশক্তি সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা, সেখানে লোকে সংসারধর্মে বিরাগী। পরিণয়াদিতে সাধারণ লোকের অনুরাগের ফল প্রজাবৃদ্ধি। অতএব ব্রিটিশ শাসনে প্রজাবৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজাবৃদ্ধির ফল, কৃষিকার্যের বিস্তার। যে দেশে লক্ষ লোকের মাত্র আহারোপযোগী শস্যের আবশ্যক, সে দেশে বাণিজ্যের প্রয়োজন বাদে কেবল তদুপযুক্ত ভূমিই কর্ষিত হইবে— কেন না, অনাবশ্যক শস্য—যাহা কেহ খাইবে না, ফেলিয়া দিতে হইবে—তাহা কে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উৎপাদন করিতে যাইবে? দেশের অবশিষ্ট ভূমি পতিত বা জঙ্গল বা তদ্রূপ অবস্থাবিশেষে থাকিবে। কিন্তু প্রজাবৃদ্ধি হইয়া যখন সেই এক লক্ষ লোকের স্থানে দেড় লক্ষ লোক হয়, তখন আর বেশী ভূমি আবাদ না করিলে চলে না। কেন না, যে ভূমির উৎপন্নে লক্ষ লোকমাত্র প্রতিপালিত হইত, তাহার শস্যে দেড় লক্ষ কখন চিরকাল জীবন ধারণ করিতে পারে না। সুতরাং প্রজাবৃদ্ধি হইলেই চাষ বাড়িবে। যাহা পূর্বে পতিত বা জঙ্গল ছিল, তাহা ক্রমে আবাদ হইবে। ব্রিটিশ শাসনে প্রজাবৃদ্ধি হওয়াতে সেইরূপ হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বের অপেক্ষা এক্ষণে অনেক ভূমি কর্ষিত হইতেছে।

আর এক কারণে চাষের বৃদ্ধি হইতেছে। সেই দ্বিতীয় কারণ বাণিজ্যবৃদ্ধি। বাণিজ্য বিনিময়মাত্র। আমরা যদি ইংলণ্ডের বস্ত্রাদি

লই, তবে তাহার বিনিময়ে আমাদের কিছু সামগ্রী ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইবে, নহিলে আমরা বস্ত্র পাইব না। আমরা কি পাঠাই? অনেকে বলিবেন, "টাকা"; তাহা নহে, সেটি আমাদের দেশীয় লোকের একটি গুরুতর ভ্রম। সত্য বটে, ভারতবর্ষের কিছু টাকা ইংলণ্ডে যায়— সেই টাকাটি ভারতব্যাপারে ইংলণ্ডের মুনফা। সে টাকা ইংলণ্ড হইতে প্রাপ্ত সামগ্রীর কোন অংশের মূল্য নহে, যদি বিবেচনা কর, তাহাতেও হানি নাই। অধিকাংশের বিনিময়ে আমরা কৃষিজাত দ্রব্যসকল পাঠাই— যথা, চাউল, রেশম, কার্পাস, পাট, নীল ইত্যাদি। ইহা বলা বাহুল্য যে, যে পরিমাণে বাণিজ্যবৃদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে এইসকল কৃষিজাত সামগ্রীর আধিক্য আবশ্যক হইবে। সুতরাং দেশে চাষও বাড়িবে। ব্রিটিশ রাজ্য হইয়া পর্যন্ত এ দেশের বাণিজ্য বাড়িতেছে— সুতরাং বিদেশে পাঠাইবার জন্য বৎসর বৎসর অধিক কৃষিজাত সামগ্রীর আবশ্যক হইতেছে, অতএব এ দেশে প্রতি বৎসর চাষ বাড়িতেছে।

চাষবৃদ্ধির ফল কি? দেশের ধনবৃদ্ধি শ্রীবৃদ্ধি।· · বঙ্গদেশে দিন দিন চাষের বৃদ্ধিতে দেশের কৃষিজাত ধন বৃদ্ধি পাইতেছে।

আর একটা কথা আছে। সকলে মহাদুঃখিত হইয়া বলিয়া থাকেন, এক্ষণে দিনপাত করা ভার— দ্রব্য সামগ্রী বড় দুর্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। এই কথা নির্দেশ করিয়া অনেকেই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বর্তমান সময় দেশের পক্ষে বড় দুঃসময়, ইংরাজের রাজ্য প্রজাপীড়ক রাজ্য, এবং কলিযুগ অত্যন্ত অধর্মাক্রান্ত যুগ— দেশ উৎসন্ন গেল! ইহা যে গুরুতর ভ্রম, তাহা সুশিক্ষিত সকলেই অবগত আছেন। বাস্তবিক, দ্রব্যের বর্তমান সাধারণ দৌর্মূল্য দেশের অমঙ্গলের চিহ্ন নহে, বরং একটি মঙ্গলের চিহ্ন। সত্য বটে, যেখানে আগে আট আনায় এক মণ চাউল পাওয়া যাইত, সেখানে এখন আড়াই টাকা লাগে; যেখানে টাকায় তিন

সের ঘৃত ছিল, সেখানে টাকায় তিন পোয়া পাওয়া ভার। কিন্তু ইহাতে এমত বুঝায় না যে, বস্তুতঃ চাউল বা ঘৃত দুর্মূল্য হইয়াছে। টাকা সস্তা হইয়াছে, ইহাই বুঝায়। সে যাহাই হউক, এক টাকার ধান এখন যে দুই তিন টাকার ধান হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহার ফল এই যে, যে ভূমিতে কৃষক এক টাকা উৎপন্ন করিত, সে ভূমিতে দুই তিন টাকা উৎপন্ন হয়। যে ভূমিতে দশ টাকা হইত, তাহাতে বিশ কি ত্রিশ টাকা হয়। বঙ্গদেশের সর্বত্রই বা অধিকাংশ স্থানে এইরূপ হইয়াছে, স্মৃতরাং এই এক কারণে বঙ্গদেশের কৃষিজাত বার্ষিক আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে।

আবার পূর্বেই সপ্রমাণ করা গিয়াছে, কর্ষিত ভূমিরও আধিক্য হইয়াছে। তবে দুই প্রকারে কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে; প্রথম, কর্ষিত ভূমির আধিক্যে, দ্বিতীয়, ফসলের মূল্যবৃদ্ধিতে। যেখানে এক বিঘা ভূমিতে তিন টাকার ফসল হইত, সেখানে সেই এক বিঘায় ছয় টাকা জন্মে, আবার আর এক বিঘা জঙ্গল পতিত আবাদ হইয়া, আর ছয় টাকা; মোটে তিন টাকার স্থানে বার টাকা জন্মিতেছে।

এইরূপে বঙ্গদেশের কৃষিজাত আয় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এ পর্যন্ত তিন চারিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই বেশী টাকাটা কার ঘরে যায়? কে লইতেছে?

এ ধন কৃষিজাত— কৃষকেরই প্রাপ্য— পাঠকেরা হঠাৎ মনে করিবেন, কৃষকেরাই পায়। বাস্তবিক তাহারা পায় না। কে পায়, আমরা দেখাইতেছি।

কিছু রাজভাণ্ডারে যায়।· · বণিক্ এবং মহাজন সম্প্রদায় যে ইহার কিয়দংশ হস্তগত করিতেছে তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। · · কৃষকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, স্মৃতরাং মহাজনের লাভও বাড়িয়াছে। এবং যে বণিকেরা মাঠ

হইতে ফসল আনিয়া বিক্রয়ের স্থানে বিক্রয় করে, কৃষিজাত ধনের কিয়দংশ যে তাহাদের লাভস্বরূপে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।.. অধিকাংশ টাকাটা ভূস্বামীরই হস্তে যায়। ভূমিতে অধিকাংশ কৃষকেরই অধিকার অস্থায়ী; জমিদার ইচ্ছা করিলেই তাহাদের উঠাইতে পারেন। দখলের অধিকার অনেক স্থানেই অদ্যাপি আকাশকুসুম মাত্র। যেখানে আইন অনুসারে প্রজার অধিকার আছে, সেখানে কার্যে নাই। অধিকার থাক্ বা না থাক্, জমিদার উঠিতে বলিলেই উঠিতে হয়। কয় জন প্রজা জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়া ভিটায় থাকিতে পারে? সুতরাং যে বেশী খাজানা স্বীকৃত হইবে, তাহাকেই জমিদার বসাইবেন। পূর্বেই কথিত হইয়াছে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।.. প্রজাবৃদ্ধি হইলেই জমির খাজানা বাড়িবে। যে ভূমির আগে একজন প্রার্থী ছিল, প্রজাবৃদ্ধি হইলে তাহার জন্য দুইজন প্রার্থী দাঁড়াইবে। যে বেশী খাজানা দিবে জমিদার তাহাকেই জমি দিবেন। রামা কৈবর্তের জমিটুকু ভাল, সে এক টাকা হারে খাজানা দেয়। হাসিম শেখ সেই জমি চায়— সে দেড় টাকা হারে স্বীকার করিতেছে। জমিদার রামাকে উঠিতে বলিলেন। রামার হয়ত দখলের অধিকার নাই, সে অমনি উঠিল। নয়ত অধিকার আছে, কিন্তু কি করে? কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া জলে বাস করিবে কি প্রকারে? অধিকার বিসর্জন দিয়া সেও উঠিল। জমিদার বিঘা পিছু আট আনা বেশী পাইলেন।

এইরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কোন সময়ে না কোন সময়ে, কোন সুযোগে না কোন সুযোগে, দেশের অধিকাংশ ভূমির হারবৃদ্ধি হইয়াছে। আইন আদালতের আবশ্যক করে নাই— বাজারে যেরূপ গ্রাহকবৃদ্ধি হইলে ঝিঙ্গা পটলের দর বাড়ে, প্রজাবৃদ্ধিতে সেইরূপ জমির হার বাড়িয়াছে। সেই বৃদ্ধি, জমিদারের উদরেই গিয়াছে।

অনেকেই রাগ করিয়া এ সকল কথা অস্বীকার করিবেন। তাঁহারা বলিবেন, আইন আছে, নিরিখ আছে, জমিদারের দয়া ধর্ম আছে। আইন— সে একটা তামাশা মাত্র, বড়মানুষেই খরচ করিয়া সে তামাশা দেখিয়া থাকে। নিরিখ পূর্ববর্ণিত প্রণালীতে বাড়িয়া গিয়াছে। আর জমিদারের দয়া ধর্ম— যখন আর স্ক্রু ফিরে না, তখন লোকের প্রতি দয়া ধর্মের আবির্ভাব হয়। স্ক্রু ফিরাইয়া ফিরাইয়া বঙ্গদেশের অধিকাংশ বর্ধিত ধার্য আয় ভূস্বামিগণ আপনাদিগের হস্তগত করিয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমিদারের যে হস্তবুদ ছিল, অনেক স্থানেই তাহার ত্রিগুণ চতুর্গুণ হইয়াছে। কোথাও দশগুণ হইয়াছে। কিছু না বাড়িয়াছে, এমন জমিদারি অতি অল্প।

আমরা দেখাইলাম, এই ঈশ্বরপ্রেরিত কৃষিধনের বৃদ্ধির ভাগ, রাজা পাইয়া থাকেন, ভূস্বামী পাইয়া থাকেন, বণিক্ পায়েন, মহাজন পায়েন,— কৃষী কি পায়? যে এই ফসল উৎপন্ন করে, সে কি পায়?

আমরা এমত বলি না যে, সে কিছুই পায় না। বিন্দুবিসর্গমাত্র পাইয়া থাকে। যাহা পায়, তাহাতে তাহার কিছু অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই। অদ্যাপি ভূমির উৎপন্নে তাহার দিন চলে না। অতএব যে সামান্য ভাগ কৃষকসম্প্রদায় পায়, তাহা না পাওয়ারই মধ্যে। যার ধন, তার ধন নয়। যাহার মাথার কালঘাম ছুটিয়া ফসল জন্মে, লাভের ভাগে সে কেহ হইল না।

আমরা দেখাইলাম যে, দেশের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। অসাধারণ কৃষিলক্ষ্মী দেশের প্রতি সুপ্রসন্না। তাঁহার কৃপায় অর্থবর্ষণ হইতেছে। সেই অর্থ রাজা, ভূস্বামী, বণিক্, মহাজন সকলেই কুড়াইতেছে। অতএব সেই শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূস্বামী, বণিক্, মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকের মধ্যে কেবল নয় শত নিরানব্বই

জনের তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে, তুলুক ; আমি তুলিব না। এই নয় শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে, আমি কাহারও জয়গান করিব না।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে এক দিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃণ্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ নীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপকে টোল বন্ধ করিয়াছে ; শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল কুক্কুর। এক বৃহৎ অট্টালিকা—তাহার বড় বড় ছড়ওয়ালা থাম দূর হইতে দেখা যায়—সেই গৃহারণ্যমধ্যে শৈলশিখরবৎ শোভা পাইতেছিল। শোভাই বা কি, তাহার দ্বার রুদ্ধ, গৃহ মনুষ্যসমাগমশূন্য, শব্দহীন, বায়ুপ্রবেশের পক্ষেও বিঘ্নময়। তাহার অভ্যন্তরে ঘরের ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকার, অন্ধকারে

নিশীথফুল্লকুসুমযুগলবৎ এক দম্পতী বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল, কৃষকপত্নী আবার রূপার পৈঁচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল, যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তার পর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তার পর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র-ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয়!—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল। জোত জমা বেচিল। তার পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে

কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

রোগ সময় পাইল, জ্বর, ওলাওঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহার চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকার মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়।

মহেন্দ্র সিংহ পদচিহ্ন গ্রামে বড় ধনবান্— কিন্তু আজ ধনী নির্ধনের এক দর। এই দুঃখপূর্ণ কালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী সকলেই গিয়াছে। কেহ মরিয়াছে, কেহ পলাইয়াছে। সেই বহুপরিবারমধ্যে এখন তাঁহার ভার্যা ও তিনি স্বয়ং আর এক শিশুকন্যা। তাঁহাদেরই কথা বলিতেছিলাম।

তাঁহার ভার্যা কল্যাণী চিন্তা ত্যাগ করিয়া, গো-শালে গিয়া স্বয়ং গো-দোহন করিলেন। পরে দুগ্ধ তপ্ত করিয়া, কন্যাকে খাওয়াইয়া গোরুকে ঘাস জল দিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিলে মহেন্দ্র বলিল, "এরূপে কদিন চলিবে?"

কল্যাণী বলিল, "বড় অধিক দিন নয়। যত দিন চলে; আমি যত দিন পারি চালাই, তার পর তুমি মেয়েটি লইয়া শহরে যাইও।"

মহেন্দ্র। শহরে যদি যাইতে হয়, তবে তোমায় বা কেন এত দুঃখ দিই। চল না এখনই যাই।

পরে দুই জনে অনেক তর্ক বিতর্ক হইল।

ক। শহরে গেলে কিছু বিশেষ উপকার হইবে কি?

ম। সে স্থান হয়ত এমনি জনশূন্য, প্রাণরক্ষার উপায়শূন্য হইয়াছে।

ক। মুরশিদাবাদ, কাশিমবাজার বা কলিকাতায় গেলে প্রাণরক্ষা হইতে পারিবে। এ স্থান ত্যাগ করা সকল প্রকারে কর্ত্তব্য।

মহেন্দ্র বলিল, "এই বাড়ী বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধনে পরিপূর্ণ; ইহা যে সব চোরে লুঠিয়া লইবে।"

ক। লুঠিতে আসিলে আমরা কি দুই জনে রাখিতে পারিব? প্রাণে না বাঁচিলে ধন ভোগ করিবে কে? চল, এখনও বন্ধ সন্ধ করিয়া যাই। যদি প্রাণে বাঁচি, ফিরিয়া আসিয়া ভোগ করিব।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পথ হাঁটিতে পারিবে কি? বেহারা ত সব মরিয়া গিয়াছে, গোরু আছে ত গাড়োয়ান নাই, গাড়োয়ান আছে ত গোরু নাই।"

ক। আমি পথ হাঁটিব, তুমি চিন্তা করিও না।

কল্যাণী মনে মনে স্থির করিলেন যে, না হয় পথে মরিয়া পড়িয়া থাকিব, তবু ত ইহারা দুই জন বাঁচিবে।

পরদিন প্রভাতে দুই জনে কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া, ঘরদ্বারের চাবি বন্ধ করিয়া, গোরুগুলি ছাড়িয়া দিয়া, কন্যাটিকে কোলে লইয়া, রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে মহেন্দ্র বলিলেন, "পথ অতি দুর্গম। পায়ে পায়ে ডাকাত লুঠেরা ফিরিতেছে, শুধু হাতে যাওয়া উচিত নয়।" এই বলিয়া মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বন্দুক, গুলি, বারুদ লইয়া গেলেন।

দেখিয়া কল্যাণী বলিলেন, "যদি অস্ত্রের কথা মনে করিলে, তবে তুমি একবার সুকুমারীকে ধর। আমিও হাতিয়ার লইয়া আসিব।" এই বলিয়া কল্যাণী কন্যাকে মহেন্দ্রের কোলে দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মহেন্দ্র বলিলেন, "তুমি আবার কি হাতিয়ার লইবে?"

কল্যাণী আসিয়া একটি বিষের ক্ষুদ্র কৌটা বস্ত্রমধ্যে লুকাইল। দুঃখের দিনে কপালে কি হয় বলিয়া কল্যাণী পূর্বেই বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

জ্যৈষ্ঠ মাস, দারুণ রৌদ্র, পৃথিবী অগ্নিময়, বায়ুতে আগুন ছড়াইতেছে, আকাশ তপ্ত তামার চাঁদোয়ার মত, পথের ধূলিসকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ। কল্যাণী ঘামিতে লাগিল, কখনও বাবলা গাছের ছায়ায়, কখনও খেজুর গাছের ছায়ায় বসিয়া বসিয়া, শুষ্ক পুষ্করিণীর কর্দমময় জল পান করিয়া কত কষ্টে পথ চলিতে লাগিল। মেয়েটি মহেন্দ্রের কোলে— এক একবার মহেন্দ্র মেয়েকে বাতাস দেয়। একবার এক নিবিড় শ্যামলপত্ররঞ্জিত সুগন্ধকুসুমসংযুক্ত লতাবেষ্টিত বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া দুই জনে বিশ্রাম করিল। মহেন্দ্র কল্যাণীর শ্রমসহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বস্ত্র ভিজাইয়া মহেন্দ্র নিকটস্থ পল্বল হইতে জল আনিয়া আপনার ও কল্যাণীর মুখে, হাতে, পায়ে, কপালে সিঞ্চন করিলেন।

কল্যাণী কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু দুই জনে ক্ষুধায় বড় আকুল হইলেন। তাও সহ্য হয়— মেয়েটির ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য হয় না। অতএব আবার তাঁহারা পথ বাহিয়া চলিলেন। সেই অগ্নিতরঙ্গ সন্তরণ করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে এক চটিতে পৌছিলেন। মহেন্দ্রের মনে মনে বড় আশা ছিল, চটিতে গিয়া স্ত্রী-কন্যার মুখে শীতল জল দিতে পারিবেন, প্রাণরক্ষার জন্য মুখে আহার দিতে পারিবেন। কিন্তু কই? চটিতে ত

মনুষ্য নাই! বড় বড় ঘর পড়িয়া আছে, মানুষ সকল পলাইয়াছে। মহেন্দ্র ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া স্ত্রী-কন্যাকে একটি ঘরের ভিতর শোয়াইলেন। বাহির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক হাঁক করিতে লাগিলেন। কাহারও উত্তর পাইলেন না। তখন মহেন্দ্র কল্যাণীকে বলিলেন, "একটু তুমি সাহস করিয়া একা থাক, দেশে যদি গাই থাকে, শ্রীকৃষ্ণ দয়া করুন, আমি দুধ আনিব।" এই বলিয়া একটা মাটির কলসী হাতে করিয়া মহেন্দ্র নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কলসী অনেক পড়িয়া ছিল।

মহেন্দ্র চলিয়া গেল। কল্যাণী একা বালিকা লইয়া সেই জনশূন্য স্থানে প্রায়-অন্ধকার কুটীরমধ্যে চারি দিক্‌ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার মনে মনে বড় ভয় হইতেছিল। কেহ কোথাও নাই, মনুষ্য-মাত্রের কোন শব্দ পাওয়া যায় না, কেবল শৃগাল কুক্কুরের রব। ভাবিতেছিলেন, কেন তাঁহাকে যাইতে দিলাম, না হয় আর কিছুক্ষণ ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিতাম। মনে করিলেন, চারি দিকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসি। কিন্তু একটি দ্বারেও কপাট বা অর্গল নাই। এইরূপ চারি দিক্‌ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ দ্বারে একটা কি ছায়ার মত দেখিলেন। মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়, কিন্তু মনুষ্যও বোধ হয় না। অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্যের মত কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সেই ছায়া যেন একটা হাত তুলিল, অস্থিচর্মবিশিষ্ট, অতি দীর্ঘ, শুষ্ক হস্তের দীর্ঘ শুষ্ক অঙ্গুলি দ্বারা কাহাকে যেন সংকেত করিয়া ডাকিল। কল্যাণীর প্রাণ শুকাইল। তখন সেইরূপ আর একটা ছায়া—শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, উলঙ্গ,—প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর আর একটা আসিল। তার পর আরও একটা আসিল। কত আসিল, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে

তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই প্রায়-অন্ধকার গৃহ নিশীথ-শ্মশানের মত ভয়ংকর হইয়া উঠিল। তখন সেই প্রেতবৎ মূর্তিসকল কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণী প্রায় মূর্ছিতা হইলেন। কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণ পুরুষেরা তখন কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ধরিয়া তুলিয়া, গৃহের বাহির করিয়া, মাঠ পার হইয়া এক জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পরে মহেন্দ্র কলসী করিয়া দুগ্ধ লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইল। দেখিল, কেহ কোথাও নাই, ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিল, কন্যার নাম ধরিয়া, শেষ স্ত্রীর নাম ধরিয়া অনেক ডাকিল, কোন উত্তর, কোন সন্ধান পাইল না।

কার্‌বালা

মীর মশার্‌রফ হোসেন মরহুম্

ঈশ্বরের মহিমার অন্ত নাই। একটি সামান্য বৃক্ষপত্রে তাঁহার শত সহস্র মহিমা প্রকাশ পাইতেছে। একটি পতঙ্গের ক্ষুদ্র পালকে তাঁহার অনন্ত শিল্পকার্য বিভাসিত হইতেছে। অনন্ত বালুকারাশির একটি ক্ষুদ্র বালুকাকণাতে তাঁহার অনন্ত করুণা আঁকা রহিয়াছে। তুমি আমি সে করুণা হয়ত জানিতে পারিতেছি না; কিন্তু তাঁহার লীলাখেলার মাধুর্য, কীর্তিকলাপের বৈচিত্র্য,— বিশ্বরঙ্গভূমির বিশ্বক্রীড়া একবার পর্যালোচনা করিলে ক্ষুদ্র মানববুদ্ধি বিচেতন হয়। তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া অণুমাত্রও বুঝিবার ক্ষমতা মানুষী বুদ্ধিতে সুদুর্লভ। সেই অব্যর্থ কৌশলীর কৌশলচক্র ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে কাহার সাধ্য? ভবিষ্যৎগর্ভে

কি নিহিত আছে, কে বলিতে পারে? কোন্ বুদ্ধিমান্ বলিতে পারেন যে, মুহূর্ত-অন্তে তিনি কি ঘটাইবেন? কোন্ মহাজ্ঞানী পণ্ডিত তাঁহার কৌশলের কণামাত্র বুঝিয়া তদ্বিপরীত কার্যে সক্ষম হইতে পারেন? জগতে সকলই বুদ্ধির আয়ত্তাধীন, কিন্তু ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্যে বুদ্ধি অচল, অক্ষম, অস্ফুট এবং অতি তুচ্ছ। ষষ্টি সহস্র লোক হোসেনের সঙ্গে কুফায় যাইতেছে, সূর্যদেব পথ দেখাইতেছেন, তরু, পর্বত, নির্ঝরিণী পথের চিহ্ন দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে, কুফার পথ পরিচিত; কত লোক তন্মধ্যে রহিয়াছে, কত লোক সেই পথে যাইতেছে, চক্ষু বন্ধ করিয়াও তাহারা কুফা নগরে যাইতে অসমর্থ নহে। সেই সর্বশক্তি-মান্ পূর্ণ কৌশলীর কৌশলে আজ সকলেই অন্ধ, চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। তাঁহার যে আজ্ঞা, সেই কার্য; এক দিন যে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার আর বৈলক্ষণ্য নাই, বিপর্যয় নাই, ভ্রম নাই। একবার মনোনিবেশ-পূর্বক অনন্ত আকাশে, অনন্ত জগতে, অনন্ত প্রকৃতিতে বাহ্যিক নয়ন একেবারে নিক্ষিপ্ত করিয়া যথার্থ নয়নে দৃষ্টিপাত কর, সেই মহাশক্তির কথঞ্চিৎ শক্তি বুঝিতে পারিবে। যাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না, তাহা দেখিয়া একেবারে বিহ্বল হইতে হয়। তাঁহার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, বাক্য অব্যর্থ। হোসেন মহানন্দে কুফায় যাইতেছেন— ভাবিতেছেন, কুফায় যাইতেছি। কিন্তু ঈশ্বর যে তাঁহাকে কুফার পথ ভুলাইয়া বিজন বন কার্‌বালার পথে লইতেছেন, তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। কেবল তিনি কেন, ষষ্টি সহস্র লোক চক্ষু থাকিতেও যেন অন্ধ।

হোসেন সপরিবারে ষষ্টি সহস্র সৈন্য লইয়া নির্বিঘ্নে কুফায় যাইতেছেন। কিন্তু কত দিন যাইতেছেন, কুফার পথের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইতেছেন না। বিশ্রাম ও পরিশ্রম একত্র সম-সহযোগিতায় নিশ্চিন্ত

ভাবে যাইতেছেন। এক দিন হোসেনের অশ্বপদ মৃত্তিকায় ডুবিয়া গেল, ধরণীগর্ভে প্রবেশ করিল না— সওয়ারসহ দাবিত হইল মাত্র। কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে হঠাৎ প্রভু মহম্মদের ভবিষ্যদ্বাণী হোসেনের মনে পড়িল। নির্ভয় হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল, অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। হোসেন গণনা করিয়া দেখিলেন, আজ মহরম মাসের ৮ম তারিখ। তাহাতে আরও ভয়ে ভয়ে অশ্বে কষাঘাত করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া দেখিলেন যে, এক পার্শ্বে ঘোর অরণ্য, সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তর ; চক্ষুনির্দিষ্ট সীমামধ্যে মানবপ্রকৃতি— জীবজন্তুর নামমাত্র নাই ; আতপ-তাপ নিবারণোপযোগী কোন প্রকার বৃক্ষও নাই, কেবল বিস্তৃত প্রান্তর— মহা প্রান্তর। প্রান্তরসীমা গগনের সহিত সংলগ্ন হইয়া ধূ ধূ করিতেছে। চতুর্দিকে হায় হায় শব্দ উত্থিত হইয়া নিদারুণ দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। জনপ্রাণীর নাম নাই, কে কোথা হইতে শব্দ করিতেছে, তাহাও জানিবার উপায় নাই। বোধ হইল, যেন শূন্যপথে শত সহস্র মুখে 'হায়! হায়!!' শব্দে চতুর্দিক আকুল করিয়া তুলিয়াছে।

হোসেন সকরুণ স্বরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া সঙ্গিগণকে বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল! হাস্য পরিহাস দূর কর; সর্বশক্তিমান্ জগৎনিদান করুণাময় ঈশ্বরের নাম মনে কর। আমরা বড় ভয়ানক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই স্থানের নাম করিতে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে, হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। ভাই রে! মাতামহ বলিয়া গিয়াছেন, যে স্থানে তোমার অশ্বপদ মৃত্তিকায় দাবিয়া যাইবে, নিশ্চয় জানিও, সেই তোমার জীবন-বিনাশের নির্দিষ্ট স্থান এবং তাহারই নাম দাস্ত কারবালা। মাতামহের বাক্য অলঙ্ঘনীয়; কুফার পথ ভুলিয়া আমরা কারবালায় আসিয়াছি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তোমরা কি কর্ণে কিছু শুনিতে পাইতেছ? দৈব শব্দ কিছু শুনিতেছ?" তখন

সকলেই মনোনিবেশ করিয়া শুনিতে লাগিলেন, চতুর্দিকেই 'হায়! হায়!!' রব। ধন্য নূরনবী মহম্মদ। হোসেন বলিলেন, "মাতামহ ইহাও বলিয়া গিয়াছেন, চতুর্দিক হইতে যে স্থানে 'হায়! হায়!!' শব্দ উত্থিত হইবে নিশ্চয় জানিও সেই কার্‌বালা। ঈশ্বরের লীলা কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। কোথায় যাইব? যাইবারই বা সাধ্য কি? কোথায় দমস্ক, কোথায় মদিনা, কোথায় কুফা, কোথায় কার্‌বালা। আমি কার্‌বালায় আসিয়াছি। আর উপায় কি? ভাই সকল! ঈশ্বরের নাম করিয়া গমনে ক্ষান্ত দাও।" ক্রমে সঙ্গীরা সকলেই আসিয়া একত্রিত হইল। হোসেনের মুখে কার্‌বালার বৃত্তান্ত এবং চতুর্দিকে 'হায়! হায়!!' রব স্বকর্ণে শুনিয়া সকলের মুখে কালিমারেখা পড়িয়া গেল। যে যেখান হইতে শুনিল, সেই সেইখানেই অমনি নীরবে বসিয়া পড়িল।

হোসেন বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ! আর চিন্তা কি? ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্যে ভাবনা কি? এই স্থানেই শিবির নির্মাণ করিয়া, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহারই নাম ভরসা করিয়া থাকিব। সম্মুখে প্রান্তর, পার্শ্বে ভয়ানক বিজন বন, কোথায় যাই? অদৃষ্টে যা লেখা আছে, তাহাই ঘটিবে; এক্ষণে চিন্তা বিফল মাত্র। শিবির নির্মাণের আয়োজন কর। আমি জানি, ফেরাত নদী এই স্থানের অতি নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। কত দূর এবং কোন্ দিকে, তাহার নির্ণয় করিয়া কেহ কেহ জল আহরণে প্রবৃত্ত হও। পিপাসায় অনেকেই কাতর হইয়াছেন, আহারাদি সংগ্রহ করিয়া আপাততঃ ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ কর।"

শিবির নির্মাণ করিবার কাষ্ঠস্তম্ভ সংগ্রহ করিতে এবং রন্ধনোপযোগী কাষ্ঠ আহরণ করিতে যাহারা বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, শোণিতাক্ত কুঠার হস্তে অত্যন্ত বিষাদিত চিত্তে বাষ্পাকুল লোচনে তাহারা হোসেনের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিল, "হজরত! এমন অদ্ভুত ব্যাপার

আমরা কোন স্থানে দেখি নাই, কোন দিন কাহারও মুখে শুনিও নাই। কি আশ্চর্য! এমন আশ্চর্য ঘটনা জগতে কোন স্থানে ঘটিয়াছে কি না, তাহাও সন্দেহ। আমরা বনে নানাপ্রকার কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলাম; যে বৃক্ষের যে স্থানে কুঠারাঘাত করিলাম, সেই বৃক্ষেই অজস্র শোণিতধারা দেখিয়া ভয় হইল, ভয়ে ফিরিয়া আসিলাম। এই দেখুন, আমাদের সকলের কুঠারেই সদ্যশোণিতচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।"

হোসেন কুঠারসংযুক্ত শোণিত দর্শনে বলিতে লাগিলেন, "নিশ্চয়ই এই কারবালা। তোমরা এই স্থানে সকলে 'শহিদ' হইয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিবে, তাহারই লক্ষণ ঈশ্বর এই শোণিতচিহ্নে দেখাইতেছেন। উহাতে আর আশ্চর্যান্বিত হইও না, ঐ বন হইতেই কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনয়ন কর। দারুরস শোণিতে পরিণত দেখিয়া আর ভীত হইও না।"

সীতা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বাল্মীকির সীতা একটি সুশীলা ও শান্তস্বভাবা বালিকা—তিনি বিবাহের পর সর্বদা স্বামিশুশ্রূষায় ব্যাপৃতা থাকিতেন। রাম কৈকেয়ীর গৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন সীতাকে বনগমনের কথা বলিলেন, তখন সীতাও তাঁহার সহগামিনী হইতে উৎসুক হইলেন। এই সময়ে তাঁহাদের যে কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে সকলেরই হৃদয় করুণরসে আপ্লুত হয়। সীতা বনবাসে যাইবেন, রাম তাঁহাকে বাধা দিলেন। রাম কত বুঝাইলেন, বনগমনের নানা কষ্ট বর্ণনা করিলেন; গৃহবাসের সুখ বর্ণনা করিলেন; গৃহবাস করিলে নানাবিধ ধর্মকর্ম করিতে পারা

যায় এবং তাহা দ্বারা স্বামীর নানাবিধ কল্যাণসাধন করিতে পারা যায়। সীতা অনেক বাদানুবাদের পর বলিলেন, আমায় না লইয়া বনে যাওয়া তোমার কোনমতেই উচিত নহে। তোমার সহিত তপস্যাই করি, আর বনেই বাস করি, সেই আমার স্বর্গ। আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া কিছুতেই ক্লান্তি বোধ করিব না। তুমি আমায় যে কুশ-কাশ-শরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ও কণ্টকীবৃক্ষের ভয় দেখাইতেছ, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমার সহিত গমনকালে তাহাদের স্পর্শ তূলা ও অজিনের ন্যায় কোমল হইবে। এই বলিয়া তিনি রামের গলদেশ ধারণ করতঃ রোদন করিতে লাগিলেন। রাম তখন আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না, তিনি উঁহাকে বনে লইয়া যাইব বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

রামের সহিত শ্বশ্রূ-শ্বশুরদিগকে প্রণাম করিয়া সীতা বসন-ভূষণ পরিত্যাগপূর্বক জটা ও বল্কল ধারণ করিতে গেলেন। তিনি নিতান্ত মুগ্ধস্বভাবা, বল্কল কিরূপে ধারণ করিতে হয় জানেন না, তিনি একখানি চীরবস্ত্র হস্তে ধারণ ও অপরখানি স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে রামের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং অপ্রতিভমুখে সাশ্রুনয়নে রামকে কহিলেন, স্বামিন্! চীরধারণ কিরূপে করিতে হয়? রাম তখন সীতার কৌষেয় বস্ত্রের উপরি চীরদ্বয় সংযোগ করিয়া দিলেন। তাহার পর সীতা স্বামীর সহিত বনে বনে নানা কষ্ট পাইয়াছেন। পথগমনে তিনি সর্বদাই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। কদর্য বনফল মাত্র তাঁহার আহার ছিল। পর্ণশয্যায় শয়ন ছিল। কিন্তু তাঁহার সে সকল কষ্ট কেবল রামমুখাবলোকন করিয়া দূর হইত। চিত্রকূট হইতে পঞ্চবটীগমনসময়ে সীতা রামকে অকারণ বৈর করিতে নিষেধ করিয়া একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

যখন রাবণ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, সে রথের উপরে

তাঁহাকে কত বুঝাইতে লাগিল—সীতে, আমিই তোমার সদৃশ পতি। তুমি আমার স্ত্রী হও। দেবতারাও তোমার অধীন হইবে। আমার পাটরানীও তোমার দাসী হইবে। পাঁচ হাজার দাসী তোমার পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিবে। সীতা তাহার কথায় কর্ণপাতও না করিয়া তাহাকে বলিলেন, রামের সহিত তুলনায় তুমি শৃগালস্বরূপ, দাঁড়কাকস্বরূপ। আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। তুমি আমায় হরণ করিতেছ, ইহার জন্য তোমায় সবংশে মরিতে হইবে।

যখন রাবণের অন্তঃপুরে তিনি বন্দী, রাবণ প্রত্যহ তাঁহার উপাসনা করে, তাঁহার পায়ে পড়িয়া তাঁহার প্রীতি উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করে; সীতা তাহাকে কেবল বলেন, রাম নামে পরম ধার্মিক পুরুষ, তিন লোকে বিখ্যাত, তাঁহার বাহু দীর্ঘ ও নয়ন বিশাল, তিনিই আমার স্বামী ও আমার দেবতা।

অনেক দিন এইরূপে গেলে একদিন রাবণ বলিল, তুমি যদি আর এক মাসের মধ্যে আমায় স্বামী বলিয়া স্বীকার না কর তোমার মাংস-ভোজন করিয়া মনস্কামনা পূর্ণ করিব। তখন পতিপরায়ণা সীতা অণুমাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন, আমার এ শরীর সংজ্ঞাশূন্য, তুমি ইচ্ছা হয় ইহাকে রক্ষা কর, ইচ্ছা হয় ইহাকে নাশ কর, আমি আমার শরীর ও জীবন কিছুই রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি না।

হনুমান্ আসিয়া অশোকবনমধ্যে সীতাকে দেখিলেন। সীতা শোকভারে আক্রান্ত হইয়া ক্রমাগত অশ্রুপাত করিতেছেন; রাবণ তাঁহার নিকট বহুসংখ্যক রাক্ষসী রাখিয়া দিয়াছে। তাহারা দিনরাত তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতেছে, ভয় দেখাইতেছে, কখন বা তাঁহাকে মুখব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে কিন্তু তিনি আপন গুণে সেই ভয়ানক রাক্ষসপুরীমধ্যেও ত্রিজটা ও সরমা নাম্নী দুই

রাক্ষসীকে সখী পাইয়াছেন। তাহারা অবসর পাইলেই তাঁহাকে সান্ত্বনা করে।

হনুমান্‌কে দেখিয়া সীতা অনেক দিনের পর আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি হনুমান্‌কে আশীর্বাদ করিলেন, রামকে আপন মনের কথা বলিয়া পাঠাইলেন। তখন তাঁহার ভরসা হইল, রাম তাঁহাকে অবশ্য উদ্ধার করিবেন।

রাবণবধের পর বিভীষণকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া রামচন্দ্র সীতাকে আনয়ন করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। সীতা উপস্থিত হইলে বলিলেন, সীতে! আমি তোমার উদ্ধারসাধন করিয়াছি, শত্রুনাশ করিয়াছি এবং কলঙ্ক অপনয়ন করিয়াছি। আজি বিভীষণাদির শ্রম সফল হইল। এইসকল কথা শুনিয়া সীতার মুখ বিকসিত হইল; আনন্দাশ্রুতে তাঁহার মুখ ভাসিয়া গেল। তখন রাম কর্কশস্বরে কহিলেন, জানকি! আমার কর্ম আমি করিয়াছি। কিন্তু তোমাকে আমি গ্রহণ করিতে পারি না। তুমি পরগৃহে অনেক দিন বাস করিয়াছ। আমি সৎকুলপ্রসূত হইয়া তোমাকে গ্রহণ করিলে কেবল নিন্দাভাগী হইব মাত্র। অতএব তোমায় অনুমতি দিতেছি, তোমার যাহাকে ইচ্ছা হয়, আশ্রয় করিয়া জীবন রক্ষা কর।

সীতা এই পরুষবাক্যে অত্যন্ত ব্যথিতা হইয়া বাষ্পমোচন করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, স্বামিন্, তুমি আমাকে প্রাকৃত রমণীর ন্যায় ভাবিলেও আমি লঙ্কাপুরীর মধ্যে কি অবস্থায় বাস করিয়াছি, তোমার দূত হনুমান্ সম্পূর্ণরূপে অবগত আছে। অতএব এক্ষণে আমাকে এরূপে পরিত্যাগ করা কি যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে? তুমি যে বাল্যকালে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ, সে কথা একবার মনেও করিলে না! আমার স্বভাব ও ভক্তির কথা সমস্তই ভুলিয়া গেলে?

এই বলিয়া লক্ষ্মণকে চিতাসজ্জা করিতে কহিলেন এবং সর্বসমক্ষে বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বহ্নিপ্রবেশসময়ে দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, যেহেতু আমার মন কখনও রাম হইতে অপনীত হয় নাই, অতএব লোকসাক্ষী পাবক আমায় রক্ষা করুন। যেহেতু রামচন্দ্র আমায় শুদ্ধচরিত্রা বলিয়া জানেন, অতএব লোকসাক্ষী পাবক আমায় রক্ষা করুন। যেহেতু আমি কায়মনোবাক্যে রামচন্দ্রেরই সেবা করিয়াছি, অন্য কাহারও কথা কখনও মনে করি নাই, অতএব লোকসাক্ষী পাবক আমায় রক্ষা করুন।

অগ্নিপ্রবেশ করিলে তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি হইল না। সকলে ধন্য ধন্য বলিয়া তাঁহার সাধুবাদ করিতে লাগিল।

সীতা কিছুকাল অযোধ্যায় রামগৃহে অবস্থান করিলে পর ভদ্রক নামে একজন লোক প্রসঙ্গক্রমে সভামধ্যে বলিল, রাবণগৃহে বহুকাল থাকিলেও রাম সীতাকে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রজারা অনেকে তাঁহার নিন্দা করে। রাম ক্ষত্রিয় পুরুষ, তাঁহার ধমনীতে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়শোণিত প্রধাবিত, তিনি তৎক্ষণাৎ সীতা-পরিত্যাগে সংকল্প করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, তুমি আশ্রমগমনব্যপদেশে সীতাকে ভাগীরথীতীরে পরিত্যাগ করিয়া আইস। লক্ষ্মণও সীতাকে লইয়া গেলেন। সীতা নিদারুণ পরিত্যাগ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল হতচেতন হইয়া রহিলেন। পরে লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস, নিরন্তর নিতান্ত দুঃখভোগের জন্যই আমার দেহ সৃষ্ট হইয়াছিল। আমি পূর্বজন্মে যে কি পাপ করিয়াছিলাম, কোন্ পতিপরায়ণা নারীকে অসহ্য পতিবিরহযন্ত্রণা দিয়াছিলাম বলিতে পারি না, নচেৎ নৃপতি আমায় কেন পরিত্যাগ করিবেন? পুনশ্চ বলিলেন, লক্ষ্মণ, তুমি আর্যপুত্রকে বলিও যে তিনি আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করুন না কেন, তিনিই আমার পরম গতি। তাঁহাকে

সর্বদা আপন কর্মে অবহিত হইতে বলিও। এরূপ সময়েও সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত পতিকল্যাণকামনা করা প্রাকৃত রমণীর কার্য নহে। সীতার বাক্যের প্রত্যেক অক্ষরেই তাঁহার হৃদয়ের গভীর ভাব এবং অলৌকিক প্রণয় প্রকাশ পাইতেছে।

অনাথা সীতা আবার দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিলেন এবং ঋষিরা আবার রামকে তাঁহার পুনর্গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। রামও আবার সর্বসমক্ষে সীতার পরীক্ষা লইতে সংকল্প করিলেন। এবার অগ্নিপরীক্ষা নহে—এবার শপথ। সীতা যখন সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার নয়ন স্বপদে অর্পিত, তাঁহার মনের ভাব কিরূপ তাহা বর্ণনা করা দুরূহ। তাঁহার অলৌকিক অনির্বচনীয় প্রণয় পূর্ববৎই আছে; কিন্তু সভামধ্যে পুনঃপুনঃ পরীক্ষা দেওয়ায় তাঁহার মনে দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে; প্রাচীন রমণীসুলভ তেজও বিলক্ষণ আছে। তিনি সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া কোনদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া করুণস্বরে স্বীয় জননী পৃথিবীদেবীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তখনকার অবস্থা মনে পড়িলে এবং তাঁহার সকরুণ বচনাবলী পাঠ করিলে পাষাণহৃদয়ও দ্রবীভূত হয় এবং সহৃদয়হৃদয়ে গভীর শোকসাগর উথলিয়া উঠে। তিনি বলিতে লাগিলেন, যেহেতু রাম ভিন্ন অন্য কাহার কথা আমি কখন মনেও করি নাই, অতএব হে দেবি পৃথিবি, তুমি আমায় অবকাশ প্রদান কর। যেহেতু চিরকাল কায়মনোবাক্যে রামেরই পূজা করিয়া আসিতেছি, অতএব হে দেবি পৃথিবি, তুমি আমায় অবকাশ প্রদান কর। যেহেতু আমি সত্য বলিতেছি যে আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না, অতএব হে দেবি, তুমি আমায় স্থান দেও।

সভাসুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ হইল। ঋষিগণ অশ্রুজল বিসর্জন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র মূর্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। ভূগর্ভ বিদীর্ণ হইয়া গেল। সহসা প্রদীপ্তজ্যোতিঃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধরণীদেবী আবির্ভূত হইলেন এবং সীতাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া পাতালমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।· ·

সীতা সর্বগুণসম্পন্না ছিলেন; তাঁহার ন্যায় পতিপরায়ণা আর কেহ ছিল কি না সন্দেহ। তাঁহাকে যাদৃশ প্রলোভনে পড়িতে হইয়াছিল, কোনকালে কোন নারী তাদৃশ প্রলোভনে পড়িয়াছিল কি না সন্দেহ। অদৃষ্টের দোষে তাঁহাকে নানা কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তিনি রাজনন্দিনী ও সসাগরা ধরণীপতির মহিষী হইয়াও একপ্রকার জন্মদুঃখিনী হইয়া ছিলেন। প্রথমতঃ স্বামীর সহিত বনে গেলেন। তথায় রাবণ তাঁহাকে হরণ করিল। তিনি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। তাহার পর স্বামী তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সে দায়ে কোনরূপে উদ্ধার পাইলেন। আবার মিথ্যাপবাদভীত হইয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। এবার তিনি বনে বনে একাকিনী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে প্রায় যাবজ্জীবন কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু শেষকালে তিনি সশরীরে ভগবতী পৃথিবীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

সীতা ও সাবিত্রী দুইজনই অদ্বিতীয় রমণী। পৃথিবীর কোন দেশের কোন কবিই স্বীয় কল্পনাশক্তিবলে উঁহাদের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্না রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সীতার স্নেহপ্রবৃত্তি অলৌকিক, সুখ-দুঃখ, বিপৎ-সম্পদ্ সকল সময়েই স্বামীর প্রতি তাঁহার মনোভাব অবিচলিত। দেবর লক্ষ্মণের প্রতি তাঁহার স্নেহ সর্বদা সমান। দেবর তাঁহাকে বনমধ্যে একাকিনী রাখিয়া আসিলেন, তথাপি তিনি উঁহাকে

আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন এবং গুরুজনকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী স্বামীর বিরহে জীবন দিতে প্রস্তুত। তাঁহাদের উভয়েরই বুদ্ধিবৃত্তি সমান প্রভাবশালিনী। সীতা রাবণের সহিত, সাবিত্রী যমরাজের সহিত কথোপকথনে ইহার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সীতা অপেক্ষা সাবিত্রী কর্মক্ষমতায় অনেক উৎকৃষ্ট। বাল্মীকি কোন স্থলেই সীতার কর্মক্ষমতার পরিচয় দেন নাই। তিনি উঁহাকে সুশীলা ও একান্ত সুধীরস্বভাবা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাবিত্রীও ধীর-স্বভাবা সন্দেহ নাই, কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে তিনি কোন শ্রমকেই শ্রম জ্ঞান করেন নাই; এবং এমন কষ্ট নাই যে তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহাদের দুইজনেরই মনের তেজস্বিতা আছে। যমরাজও সাবিত্রীর তেজস্বিতা স্বীকার করিয়াছেন। সীতাও দ্বিতীয়বার পরীক্ষার সময়ে উহার পরিচয় দিয়াছেন। কর্মক্ষমতা-বিষয়ে সাবিত্রী সীতা অপেক্ষা উন্নতস্বভাবা হইলেও তাঁহার স্নেহপ্রবৃত্তি সম্যক্ প্রকাশিত হয় নাই। সীতা ও সাবিত্রীকে সর্বাপেক্ষা উন্নতচরিত্রা বলিবার কারণ এই যে তাঁহাদের মানসিক বৃত্তিসমূহের যুগপৎ সমুন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে

জগদীশচন্দ্র বসু

আমাদের বাড়ীর নিম্নেই গঙ্গা প্রবাহিত। বাল্যকাল হইতেই নদীর সহিত আমার সখ্য জন্মিয়াছিল। বৎসরের এক সময়ে কূলপ্লাবন করিয়া জলস্রোত বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইত; আবার হেমন্তের শেষে ক্ষীণ কলেবর ধারণ করিত। প্রতিদিন জোয়ারভাঁটায়

বারিপ্রবাহের পরিবর্তন লক্ষ্য করিতাম। নদীকে আমার একটি গতিপরিবর্তনশীল জীব বলিয়া মনে হইত। সন্ধ্যা হইলেই একাকী নদীতীরে আসিয়া বসিতাম। ছোট ছোট তরঙ্গগুলি তীরভূমিতে আছড়াইয়া পড়িয়া কুলুকুলু গীত গাহিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইত! যখন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিত, এবং বাহিরের কোলাহল একে একে নীরব হইয়া যাইত, তখন নদীর সেই কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে কত কথাই শুনিতে পাইতাম! কখন মনে হইত, এই-যে অজস্র জলধারা প্রতিদিন চলিয়া যাইতেছে, ইহা ত কখন ফিরে না; তবে এই অনন্ত স্রোত কোথা হইতে আসিতেছে? ইহার কি শেষ নাই? নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" নদী উত্তর করিত, "মহাদেবের জটা হইতে।" তখন ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন-বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইত। তাহার পর, বড় হইয়া নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা শুনিয়াছি; কিন্তু যখনই শ্রান্তমনে নদী-তীরে বসিয়াছি তখনই সেই চিরাভ্যস্ত কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে সেই পূর্বকথা শুনিতাম, "মহাদেবের জটা হইতে।"

একবার নদীতীরে আমার এক প্রিয়জনের পার্থিব অবশেষ চিতানলে ভস্মীভূত হইতে দেখিলাম। আমার সেই আজন্মপরিচিত বাৎসল্যের বাসমন্দির সহসা শূন্যে পরিণত হইল। সেই স্নেহের এক গভীর বিশাল প্রবাহ কোন্ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় দেশে বহিয়া চলিয়া গেল। যে যায়, সে ত আর ফিরে না; তবে কি সে অনন্তকালের জন্য লুপ্ত হয়? মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি? যে যায় সে কোথা যায়? আমার প্রিয়জন আজ কোথায়?

তখন নদীর কলধ্বনির মধ্যে শুনিতে পাইলাম, "মহাদেবের পদতলে!"

চতুর্দিক্ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, কুলুকুলু শব্দের মধ্যে শুনিতে পাইলাম, "আমরা যথা হইতে আসি, আবার তথায় ফিরিয়া যাই। দীর্ঘ প্রবাসের পর উৎসে মিলিত হইতে যাইতেছি।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথা হইতে আসিয়াছ নদী?" নদী সেই পুরাতন স্বরে উত্তর করিল, "মহাদেবের জটা হইতে।"

একদিন আমি বলিলাম, "নদী, আজ বহুকাল অবধি তোমার সহিত আমার সখ্য। পুরাতনের মধ্যে কেবল তুমি। বাল্যকাল হইতে এ পর্যন্ত তুমি আমার জীবন বেষ্টন করিয়া আছ, আমার জীবনের এক অংশ হইয়া গিয়াছ; তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, জানি না। আমি তোমার প্রবাহ অবলম্বন করিয়া তোমার উৎপত্তিস্থান দেখিয়া আসিব।"

শুনিয়াছিলাম, উত্তর-পশ্চিমে যে তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ দেখা যায়, তথা হইতে জাহ্নবীর উৎপত্তি হইয়াছে। আমি সেই শৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া, বহু গ্রাম জনপদ ও বিজন অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে কূর্মাচল-নামক পুরাণপ্রথিত দেশে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে সরযূনদীর উৎপত্তিস্থান দর্শন করিয়া দানবপুরে আসিলাম। তাহার পর, পুনরায় বহুল গিরিগহন লঙ্ঘনপূর্বক উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

একদিন অতীব বন্ধুর পার্বত্য পথে চলিতে চলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। আমার চতুর্দিকে পর্বতমালা, তাহাদের পার্শ্বদেশে নিবিড় অরণ্যানী; এক অভ্রভেদী শৃঙ্গ তাহার বিরাট দেহ দ্বারা পশ্চাতের দৃশ্য অন্তরাল করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমার পথপ্রদর্শক বলিল, "এই শৃঙ্গে উঠিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। নিম্নে যে রজতসূত্রের ন্যায় রেখা দেখা যাইতেছে, উহাই বহু দেশ অতিক্রম করিয়া তোমাদের দেশে অতি বেগবতী কূলপ্লাবিনী স্রোতস্বতী মূর্তি

ধারণ করিয়াছে। সম্মুখস্থ শিখরে আরোহণ করিলেই দেখিতে পাইবে, এই সূক্ষ্ম সূত্রের আরম্ভ কোথায়।"

এই কথা শুনিয়া আমি সমুদয় পথশ্রম বিস্মৃত হইয়া নব উদ্যমে পর্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম। আমার পথপ্রদর্শক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "সম্মুখে দেখ, জয় নন্দাদেবী! জয় ত্রিশূল!"

কিয়ৎক্ষণ পূর্বে পর্বতমালা আমার দৃষ্টি অবরোধ করিয়াছিল। এখন উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিবামাত্র আমার সম্মুখে আবরণ অপসৃত হইল। দেখিলাম, অনন্তপ্রসারিত নীল নভোমণ্ডল। সেই নিবিড় নীল স্তর ভেদ করিয়া দুই শুভ্র তুষারমূর্তি শূন্যে উত্থিত হইয়াছে। একটি গরীয়সী রমণীর ন্যায়—মনে হইল যেন আমার দিকে সস্নেহ প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। যাঁহার বিশাল বক্ষে বহু জীব আশ্রয় ও বৃদ্ধি পাইতেছে, এই মূর্তি সেই মাতৃরূপিণী ধরিত্রীর বলিয়া চিনিলাম। ইহার অনতিদূরে মহাদেবের ত্রিশূল স্থাপিত। এই ত্রিশূল পাতালগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া মেদিনী বিদারণপূর্বক শাণিত অগ্রভাগ দ্বারা আকাশ বিদ্ধ করিতেছে। ত্রিভুবন এই মহাস্ত্রে গ্রথিত!*

এইরূপে পরস্পরের পার্শ্বে, সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্টিকর্তার হস্তের আয়ুধ, সাকাররূপে দর্শন করিলাম। এই ত্রিশূল যে স্থিতি ও প্রলয়ের চিহ্নরূপী, তাহা পরে বুঝিলাম।

আমার পথপ্রদর্শক বলিল, "সম্মুখে এখনও দীর্ঘ পথ রহিয়াছে, উহা অতীব দুর্গম; দুই দিন চলিলে পর তুষারনদী দেখিতে পাইবে।"

সেই দুই দিন বহু বন ও গিরিসংকট অতিক্রম করিয়া অবশেষে তুষারক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল সূত্রটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর

* কুমায়ুনের উত্তরে দুই তুষারশিখর দেখা যায়। একটির নাম নন্দাদেবী, অপরটি ত্রিশূল নামে খ্যাত।

হইয়া এ পর্যন্ত আসিতেছিল, কল্লোলিনীর মৃদু গীত এত দিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল, সহসা যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপ্রভাবে সে গীত নীরব হইল, নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম, স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড উর্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে, যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে 'তিষ্ঠ' বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিকখনি নিঃশেষ করিয়া এই বিশালক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

দুই দিকে উচ্চ পর্বতশ্রেণী, বহুদূরপ্রসারিত সেই পর্বতের পাদমূল হইতে উত্তুঙ্গ ভৃগুদেশ পর্যন্ত অগণ্য উন্নত বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। শিখর-তুষার-নিঃসৃত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল এখন আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুজ্ঝটিকা; এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবারিত হইবে।

তুষারনদীর উপর দিয়া ঊর্ধ্বে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এই নদী ধবলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে আসিতেছে। আসিবার সময়ে পর্বতদেহ ভগ্ন করিয়া প্রস্তরস্তূপ বহন করিয়া আনিতেছে, সেই প্রস্তরস্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অতি দুরারোহ স্তূপ হইতে স্তূপান্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যত ঊর্ধ্বে উঠিতেছি, বায়ুস্তর ততই ক্ষীণতর হইতেছে; সেই ক্ষীণ বায়ু দেবধূপের সৌরভে পরিপূর্ণ। ক্রমে শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল; অবশেষে হতচেতনপ্রায় হইয়া নন্দাদেবীর পদতলে পতিত হইলাম।

সহসা শত শত শঙ্খনাদ একত্র কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। অর্ধোন্মীলিত নেত্রে দেখিলাম, সমগ্র পর্বত ও বনস্থলীতে পূজার আয়োজন হইয়াছে। জলপ্রপাতগুলি যেন সুবৃহৎ কমণ্ডলু-মুখ হইতে পতিত হইতেছে;

সেই-সঙ্গে পারিজাত-বৃক্ষসকল স্বতঃ পুষ্পবর্ষণ করিতেছে। দূরে দিক্ আলোড়ন করিয়া শঙ্খধ্বনির ন্যায় গভীর ধ্বনি উঠিতেছে। ইহা শঙ্খধ্বনি কি পতনশীল তুষারপর্বতের বজ্রনিনাদ স্থির করিতে পারিলাম না।

কতক্ষণ পরে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যে কুজ্ঝটিকা নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আচ্ছন্ন করিয়া ছিল, তাহা ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া শূন্য-মার্গ আশ্রয় করিয়াছে। নন্দাদেবীর শিরোপরি এক অতি বৃহৎ ভাস্বর জ্যোতি বিরাজ করিতেছে, তাহা একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূমরাশি দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে এই কি মহাদেবের জটা? এই জটা পৃথিবীরূপিণী নন্দাদেবীকে চন্দ্রাতপের ন্যায় আবরণ করিয়া রাখিয়াছে! এই জটা হইতে হীরককণার তুল্য তুষারকণাগুলি নন্দাদেবীর মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এই কঠিন হীরককণাই ত্রিশূলাগ্রে শাণিত করিতেছে।

শিব ও রুদ্র! রক্ষক ও সংহারক! এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। মানসচক্ষে উৎস হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও পুনরায় উৎসে প্রত্যাবর্তন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই মহাচক্র-প্রবাহিত স্রোতে সৃষ্টি ও প্রলয়-রূপ পরস্পরের পার্শ্বে স্থাপিত দেখিলাম।

সম্মুখে আকাশভেদী যে পর্বতশ্রেণী দেখিতেছি, হিমাণুরূপ বারিকণা উহাদের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। প্রবেশ করিয়া মহাবিক্রমে উহাদের দেহ বিদীর্ণ করিতেছে। চ্যুত শিখর বজ্রনিনাদে নিম্নে পতিত হইতেছে।

বারিকণারাই নিম্নে শুভ্র তুষারশয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। ভগ্ন শৈল এই তুষারশয্যায় শায়িত হইল। তখন কণাগুলি একে অন্যকে

ডাকিয়া বলিল, "আইস, আমরা ইহার অস্থি দিয়া পৃথিবীর দেহ নূতন করিয়া নির্মাণ করি।"

কোটি কোটি ক্ষুদ্র হস্ত অসংখ্য অণুপ্রমাণ শক্তির মিলনে, অনায়াসে সেই পর্বতভার বহিয়া নিম্নে চলিল। কোন পথ ছিল না, পতিত পর্বতখণ্ডের ঘর্ষণেই পথ কাটিয়া লইল— উপত্যকা রচিত হইল। পর্বত-গাত্রে ঘর্ষিত হইতে হইতে উপলস্তূপ চূর্ণীকৃত হইল।

আমি যে স্থানে বসিয়া আছি, তাহার উভয়তঃ তুষারবাহিত প্রস্তরখণ্ড রাশীকৃত রহিয়াছে। ইহার নিম্নেই তুষারকণা তরলাকৃতি ধারণ করিয়া ক্ষুদ্র সরিতে পরিণত হইয়াছে। এই সরিৎ পর্বতের অস্থিচূর্ণ বহন করিয়া গিরিদেশ অতিবর্তন করিয়া বহুল সমৃদ্ধ নগর-জনপদের মধ্য দিয়া সাগরোদ্দেশে প্রবাহিত হইতেছে।

পথে এক স্থানে উভয়কূলস্থ দেশ মরুভূমিপ্রায় হইয়াছিল। নদী তট উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ প্লাবিত করিল। পর্বতের অস্থিচূর্ণ-সংযোগে মৃত্তিকার উর্বরতা-শক্তি বর্ধিত হইল। কঠিন পর্বতের দেহাবশেষ দ্বারা বৃক্ষলতার সজীব শ্যাম দেহ নির্মিত হইল।

বারিকণাগণই বৃষ্টিরূপে পৃথিবী ধৌত করিতেছে, এবং মৃত ও পরিত্যক্ত দ্রব্য বহন করিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে। তথায় মনুষ্যচক্ষুর অগোচরে নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইতেছে। সমুদ্রে মিলিত বারিকণাকুল সর্বদা বিতাড়িত হইয়া বেলাভূমি ভগ্ন করিতেছে। জলকণা কখনও ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া পাতালপুরস্থ অগ্নিকুণ্ডে আহুতিস্বরূপ হইতেছে। সেই মহাযজ্ঞোত্থিত ধূমরাশি পৃথিবী বিদারণ করিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গাররূপে প্রকাশ পাইতেছে; সেই মহাতেজে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে; উর্ধ্বভূমি অতলে নিমজ্জিত ও সমুদ্রতল উন্নত হইয়া নূতন মহাদেশ নির্মিত হইতেছে।

সমুদ্রে পতিত হইয়াও বারিবিন্দুগণের বিশ্রাম নাই। সূর্যের তেজে উত্তপ্ত হইয়া ইহারা উর্ধ্বে উড্ডীন হইতেছে। ইহারাই একদিন অশনি ও ঝঞ্ঝা-বলে পর্বতশিখরাভিমুখে ধাবিত হইয়া, তথায় বিপুল জটাজাল-মধ্যে আশ্রয় লইবে ; আবার কালক্রমে বিশ্রামান্তে পর্বতপৃষ্ঠে তুহিনাকারে পতিত হইবে। এই গতির বিরাম নাই, শেষ নাই !

এখনও ভাগীরথীতীরে বসিয়া তাহার কুলুকুলু ধ্বনি শ্রবণ করি। এখনও তাহাতে পূর্বের ন্যায় কথা শুনিতে পাই। এখন আর বুঝিতে ভুল হয় না।

"নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ," ইহার উত্তরে এখনও সুস্পষ্ট স্বরে শুনিতে পাই—

"মহাদেবের জটা হইতে।"

স্বাধীন শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এমন দিন ছিল যখন ইংরেজি পাঠশালা হইতে আমাদের একেবারে ছুটি ছিল না। বাড়ি আসিতাম, সেখানেও পাঠশালা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া আসিত। বন্ধুকেও সম্ভাষণ করিতাম ইংরেজিতে, পিতাকেও পত্র লিখিতাম ইংরেজিতে, প্রাণের কথা বলিতাম ইংরেজি কাব্যে, দেশের লোককে সভায় আহ্বান করিতাম ইংরেজি বক্তৃতায়। আজ যখন সেই পাঠশালা হইতে একেবারে না হউক, ক্ষণে ক্ষণে ছুটি পাইয়া থাকি, তখন সেই ছুটির সময়টাতে আনন্দ করিব কোথায় ? পাঠশালার বাহিরে সমস্ত দেশের মধ্যে আমাদের শিক্ষালাভের কি কোনো স্বাধীন ক্ষেত্র নাই ?

য়ুরোপের ন্যায় যে দেশে নানা আলোচনা, নানা বাদপ্রতিবাদের ভিতর দিয়া পাঠ্যবিষয়গুলি প্রত্যহ প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে, যাঁহারা আবিষ্কার করিতেছেন, সৃষ্টি করিতেছেন, প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারাই যেখানে শিক্ষা দিতেছেন, সেখানে শিক্ষা জড়শিক্ষা নহে। সেখানে কেবল যে বিষয়গুলিকেই পাওয়া যায় তাহা নহে, সেইসঙ্গে দৃষ্টির শক্তি, মননের উদ্যম, সৃষ্টির উৎসাহ পাওয়া যায়। এমন অবস্থায় পুঁথিগত বিদ্যার অসহ্য জুলুম থাকে না, গ্রন্থ হইতে যেটুকু লাভ করা যায় তাহারই মধ্যে একান্তভাবে বদ্ধ হইতে হয় না।

আমাদের দেশেও পুঁথিকে মনের রাজা না করিয়া মনকে পুঁথির উপর আধিপত্য দিবার উপায় একটু বিশেষভাবে চিন্তা ও একটু বিশেষ উদ্‌যোগের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে।

বাংলাদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য, সমস্তই আমাদের বিশেষভাবে অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়। দেশের এইসমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার ঔৎসুক্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল— কিন্তু তাহা না হইবার কারণ, নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশের জিনিস আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। কেননা, আমাদের দেশের যথার্থ বিবরণ আজ পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই, সেইজন্য যদিও আমরা স্বদেশে বাস করিতেছি তথাপি স্বদেশ আমাদের জ্ঞানের কাছে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া আছে।

জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে বস্তু চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, যে বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চা যদি প্রধানত তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে তবে সে জ্ঞান দুর্বল হইবেই।

যাহা পরিচিত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে।

বস্তুর সহিত বহির সহিত আমরা মিলাইয়া শিখিবার অবকাশ পাই না। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা যেসকল দৃষ্টান্ত আশ্রয় করে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর নহে। আমরা ইতিহাস পড়ি, কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ, নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে বাহিরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিস তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতেই পারে না। আমরা ভাষাতত্ত্ব মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করি, কিন্তু আমাদের নিজের মাতৃভাষা কালে কালে প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া যে নানা রূপান্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ-নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই ভাষারহস্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না। এক ভারতবর্ষে সমাজ ও ধর্মের যেমন বহুতর অবস্থাবৈচিত্র্য আছে এমন বোধ হয় আর কোনো দেশে নাই। অনুসন্ধানপূর্বক অভিনিবেশপূর্বক সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া দেখিলে সমাজ ও ধর্মের বিজ্ঞান আমাদের কাছে যেমন উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিবে, এমন, দূরদেশের ধর্ম ও সমাজ-সম্বন্ধীয় বই পড়িবামাত্র কখনও হইতেই পারে না।

ধারণা যখন অস্পষ্ট ও দুর্বল থাকে তখন উদ্ভাবনাশক্তির আশা করা যায় না; এমনকি, তখনকার সমস্ত উদ্ভাবনা অবাস্তব অদ্ভুত আকার ধারণ করে। এইজন্যই আমরা কেতাবে ইতিহাস শিখিয়াও ঐতিহাসিক বিচার তেমন করিয়া আয়ত্ত করিতে পারি নাই; কেতাবে বিজ্ঞান

শিখিয়াও অভূতপূর্ব কাল্পনিকতাকে বিজ্ঞান বলিয়া চালাইয়া থাকি ; ধর্ম, সমাজ, এমনকি সাহিত্য-সমালোচনাতেও অপ্রমত্ত পরিমাণবোধ রক্ষা করিতে পারি না।

অতএব এ কথা যদি সত্য হয় যে, প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বলো, ভাবই বলো, চরিত্রই বলো, নির্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে, তবে আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিষ্ফলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম— ইহারই ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির প্রতি যদি ছাত্রেরা লক্ষ রাখে তবে প্রত্যক্ষ বস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে, এবং নিজের চারি দিককে, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে।

ছাত্রেরা কেবল পরের কাছ হইতে শিক্ষা করিবে কিন্তু শিক্ষার বিষয়কে নিজে গড়িয়া তুলিতে পারিবে না, এরূপ ভীরুতা যেন তাহাদের মনে না থাকে। দেশের সাহিত্যরচনায় সহায়তা করিবার ভার তাহারাও গ্রহণ করিতে পারে। বাংলাদেশে এমন জেলা নাই যেখান হইতে কলিকাতায় ছাত্রসমাগম না হইয়াছে। দেশের সমস্ত বৃত্তান্ত-সংগ্রহে সেই ছাত্রেরা কিরূপ সাহায্য করিতে পারে ও তাহার কতদূর প্রয়োজনীয়তা তাহার দুই-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

বাংলাভাষার একখানি ব্যাকরণ এখনও রচিত হয় নাই। কাজটি সহজ নহে। কেননা এই ব্যাকরণের উপকরণ-সংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ।

আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে থাকিলে এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

বাংলায় এমন প্রদেশ নাই যেখানে স্থানে স্থানে প্রাকৃত লোকদের মধ্যে নূতন নূতন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হইতেছে। শিক্ষিত লোকেরা এগুলির কোনো খবরই রাখেন না। তাঁহারা এ কথা মনেই করেন না, প্রকাণ্ড জনসম্প্রদায় অলক্ষ্য গতিতে নিঃশব্দ চরণে চলিয়াছে, আমরা অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের দিকে তাকাই না বলিয়া যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে তাহা নহে— নূতন কালের নূতন শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই; সে পরিবর্তন কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জানা হয় না। শুধু যে দেশকে জানাই চরম লক্ষ্য তাহা আমি বলি না; যেখানেই হউক না কেন, মানব-সাধারণের মধ্যে যা-কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে তাহা ভালো করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে, পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে, কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না। ছাত্রগণ যদি স্ব স্ব প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যেসমস্ত ধর্মসম্প্রদায় আছে তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে-একটা শিক্ষা তাহাও লাভ করিবেন এবং সেইসঙ্গে দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন।

আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ ethnologyর বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি ডোম কৈবর্ত বাগ্‌দি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনই বুঝিতে

পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে— পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি, এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা থাকিবে না। আমাদের ছাত্রগণ যদি তাঁহাদের এইসকল প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজে একবার ভালো করিয়া নিযুক্ত হন তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ, অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে।

'আইডিয়া' যত বড়োই হোক, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা ক্ষুদ্র হউক, দীন হউক, তাহাকে লঙ্ঘন করিলে চলিবে না। দূরকে নিকট করিবার একমাত্র উপায় নিকট হইতে সেই দূরে যাওয়া। ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণ সুরে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র— কিন্তু ভারত-মাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা। যে ভারতমাতা ব্যাস-বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের তপোবনে শমীবৃক্ষমূলে আলবালে জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাকে করজোড়ে প্রণাম করিলেই

যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ঘরের পাশে যে জীর্ণচীরধারিণী ভারতমাতা ছেলেটাকে পড়া মুখস্থ করাইয়া চাকরির উমেদারিতে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য অর্ধাশনে পরের পাকশালে রাঁধিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাকে তো অমন কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া সারা যায় না।

ছাত্রগণ, আজ তোমাদের তারুণ্যের মধ্যে আমার অবারিত প্রবেশাধিকার নাই; তোমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আদর্শ যে কী তাহা স্পষ্টরূপে অনুভব করা আজ আমার পক্ষে অসম্ভব— কিন্তু নিজেদের নবীন কৈশোরের স্মৃতিটুকুও তো ভস্মাবৃত অগ্নিকণার মতো পক্ক কেশের নীচে এখনও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। সেই স্মৃতির বলে ইহা নিশ্চয় জানিতেছি যে, মহৎ আকাঙ্ক্ষার রাগিণী মনে যে তারে সহজে বাজিয়া উঠে, তোমাদের অন্তরের সেই সূক্ষ্ম, সেই তীক্ষ্ণ, সেই প্রভাত-সূর্যরশ্মিনির্মিত তন্তুর ন্যায় উজ্জ্বল তন্ত্রীগুলিতে এখনও অব্যবহারের মরিচা পড়িয়া যায় নাই— উদার উদ্দেশ্যের প্রতি নির্বিচারে আত্মসমর্পণ করিবার দিকে মানুষের মনের যে একটা স্বাভাবিক ও সুগভীর প্রেরণা আছে, তোমাদের অন্তঃকরণে এখনও তাহা ক্ষুদ্র বাধার দ্বারা বারংবার প্রতিহত হইয়া নিস্তেজ হয় নাই। তোমাদের সেই অনাঘ্রাত পুষ্পের মতো, অখণ্ড পুণ্যের ন্যায়, নবীন হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমি আজ তোমাদের দেশের সারস্বতবর্গের নামে আহ্বান করিতেছি; দেশের কাব্যে গানে ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণ পত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটিরে প্রত্যক্ষ বস্তুকে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা জানিবার জন্য— শিক্ষার বিষয়কে কেবল পুঁথির মধ্য হইতে মুখস্থ না করিয়া বিশ্বের মধ্যে তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। এই আহ্বানে যদি তোমরা সাড়া দাও তবেই তোমরা যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র

হইতে পারিবে; তবেই তোমরা সাহিত্যকে অনুকরণের বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে এবং দেশের চিৎশক্তিকে দুর্বলতার অবসাদ হইতে উদ্ধার করিয়া জগতের জ্ঞানীসভায় স্বদেশকে সমাদৃত করিতে পারিবে।

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি। লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিক্কণ ছিপ্‌ছিপে বালক। জাতিতে কায়স্থ। তাহার প্রভুরাও কায়স্থ। বাবুদের এক-বৎসর-বয়স্ক একটি শিশুর রক্ষণ ও পালন -কার্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্তব্য ছিল।

সেই শিশুটি কালক্রমে রাইচরণের কক্ষ ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া মুন্সেফিতে প্রবেশ করিয়াছেন। রাইচরণ এখনও তাঁহার ভৃত্য।

তাহার আর-একটি মনিব বাড়িয়াছে, মাঠাকুরানী ঘরে আসিয়াছেন; সুতরাং অনুকূলবাবুর উপর রাইচরণের পূর্বে যতটা অধিকার ছিল তাহার অধিকাংশই নূতন কর্ত্রীর হস্তগত হইয়াছে।

কিন্তু কর্ত্রী যেমন রাইচরণের পূর্বাধিকার কতকটা হ্রাস করিয়া লইয়াছেন তেমনি একটি নূতন অধিকার দিয়া অনেকটা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অনুকূলের একটি পুত্রসন্তান অল্পদিন হইল জন্মলাভ

করিয়াছে— এবং রাইচরণ কেবল নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

তাহাকে এমনি উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনি নিপুণতার সহিত তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে, তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে, উত্তরের কোনো প্রত্যাশা না করিয়া এমনসকল সম্পূর্ণ অর্থহীন অসংগত প্রশ্ন সুর করিয়া শিশুর প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে যে, এই ক্ষুদ্র শিশুটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠে।

অবশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিল্‌খিল্‌ হাস্যকলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য ও বিচারশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্বে সবিস্ময়ে বলিত, "মা, তোমার ছেলে বড়ো হলে জজ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।"

পৃথিবীতে আর-কোনো মানবসন্তান যে এই বয়সে চৌকাঠ-লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জজদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নহে।

অবশেষে শিশু যখন টল্‌মল্‌ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল সে এক আশ্চর্য ব্যাপার, এবং যখন মাকে মা, পিসিকে পিচি, এবং রাইচরণকে চন্ন বলিয়া সম্ভাষণ করিল, তখন রাইচরণ সেই প্রত্যয়াতীত সংবাদ যাহার-তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 'মাকে মা বলে, পিসিকে পিচি বলে, কিন্তু আমাকে বলে চন্ন।' বাস্তবিক শিশুর মাথায় এ বুদ্ধি কী করিয়া জোগাইল বলা শক্ত। নিশ্চয়ই কোনো বয়স্ক লোক কখনোই

এরূপ অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত না, এবং দিলেও তাহার জজের পদপ্রাপ্তি-সম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণের সম্পূর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হইত।

কিছুদিন বাদে মুখে দড়ি দিয়া রাইচরণকে ঘোড়া সাজিতে হইল। মল্ল সাজিয়া তাহাকে শিশুর সহিত কুস্তি করিতে হইত— আবার পরাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিপ্লব বাধিত।

এই সময়ে অনুকূল পদ্মাতীরবর্তী এক জিলায় বদলি হইলেন। অনুকূল তাঁহার শিশুর জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন। সাটিনের জামা এবং মাথায় একটা জরির টুপি, হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দুইগাছি মল পরাইয়া রাইচরণ নবকুমারকে দুই বেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।

বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক-এক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড়-ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ্‌ঝাপ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশ দিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুতবেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্রগতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

অপরাহ্ণে মেঘ করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। রাইচরণের খামখেয়ালি ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া বসিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে একটিও নৌকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই— মেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল, পরপারে জনহীন বালুকাতীরে শব্দহীন দীপ্ত সমারোহের সহিত সূর্যাস্তের আয়োজন হইতেছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশু সহসা এক দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "চন্ন, ফু।"

অনতিদূরে সজল পঙ্কিল ভূমির উপর একটি বৃহৎ কদম্ববৃক্ষের

উচ্চশাখায় গুটিকতক কদম্বফুল ফুটিয়াছিল, সেই দিকে শিশুর লুব্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুই-চারিদিন হইল, রাইচরণ কাঠি দিয়া বিদ্ধ করিয়া তাহাকে কদম্বফুলের গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে শিশুর এত আনন্দ বোধ হইয়াছিল যে, সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই; ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উন্নীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙিয়া ফুল তুলিতে যাইতে চন্নর প্রবৃত্তি হইল না— তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "দেখো দেখো ও—ই দেখো পাখি, ওই উড়ে—এ গেল। আয় রে পাখি, আয় আয়।" এইরূপ অবিশ্রান্ত বিচিত্র কলরব করিতে করিতে সবেগে গাড়ি ঠেলিতে লাগিল।

কিন্তু যে ছেলের ভবিষ্যতে জজ হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে তাহাকে এরূপ সামান্য উপায়ে ভুলাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা— বিশেষত চারি দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাল্পনিক পাখি লইয়া অধিকক্ষণ কাজ চলে না।

রাইচরণ বলিল, "তবে তুমি গাড়িতে বসে থাকো, আমি চট্ করে ফুল তুলে আনছি। খবরদার জলের ধারে যেয়ো না।" বলিয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া কদম্ববৃক্ষের অভিমুখে চলিল।

কিন্তু ওই-যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্বফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খল্‌খল্ ছল্‌ছল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন্-এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশুপ্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুত বেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানবশিশুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া জলের ধারে গেল— একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল— দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বার বার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্বফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, কেহ নাই। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কাহারও কোনো চিহ্ন নাই।

মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎ-সংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁয়ার মতো হইয়া আসিল। ভাঙা বুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, "বাবু— খোকাবাবু— লক্ষ্মী দাদাবাবু আমার।"

কিন্তু 'চন্ন' বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না; কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছল্‌ছল্ খল্‌খল্ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না, এবং পৃথিবীর এই-সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে উৎকণ্ঠিত জননী চারি দিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। লণ্ঠন হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দেখিল, রাইচরণ নিশীথের ঝোড়ো বাতাসের মতো সমস্ত ক্ষেত্রময় "বাবু— খোকাবাবু আমার" বলিয়া ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়াম্ করিয়া মাঠাকরুনের পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহাকে যত জিজ্ঞাসা করে সে কাঁদিয়া বলে, "জানি নে, মা।"

যদিও সকলেই মনে মনে বুঝিল পদ্মারই এই কাজ, তথাপি গ্রামের প্রান্তে যে একদল বেদের সমাগম হইয়াছে তাহাদের প্রতিও সন্দেহ দূর হইল না। এবং মাঠাকুরানীর মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, রাইচরণই বা চুরি করিয়াছে; এমনকি তাহাকে ডাকিয়া অত্যন্ত অনুনয়পূর্বক বলিলেন, "তুই আমার বাছাকে ফিরিয়ে এনে দে— তুই যত টাকা চাস তোকে দেব।" শুনিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত করিল। গৃহিণী তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

অনুকূলবাবু তাঁহার স্ত্রীর মন হইতে রাইচরণের প্রতি এই অন্যায় সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, রাইচরণ এমন জঘন্য কাজ কী উদ্দেশ্যে করিতে পারে। গৃহিণী বলিলেন, "কেন? তাহার গায়ে সোনার গহনা ছিল।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এতকাল তাহার সন্তানাদি হয় নাই। কিন্তু দৈবক্রমে বৎসর না যাইতেই তাহার স্ত্রী অধিকবয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সংবরণ করিল।

এই নবজাত শিশুটির প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিদ্বেষ জন্মিল। মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাবুর স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল, প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভগ্নী যদি না থাকিত তবে এ শিশুটি পৃথিবীর বায়ু বেশিদিন ভোগ করিতে পাইত না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ছেলেটিও কিছুদিন বাদে চৌকাঠ পার হইতে আরম্ভ করিল, এবং সর্বপ্রকার নিষেধ লঙ্ঘন করিতে

সকৌতুক চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমনকি, ইহার কণ্ঠস্বর, হাস্যক্রন্দনধ্বনি অনেকটা সেই শিশুরই মতো। এক-একদিন যখন ইহার কান্না শুনিত, রাইচরণের বুকটা সহসা ধড়াস্ করিয়া উঠিত; মনে হইত, দাদাবাবু রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাঁদিতেছে।

ফেল্‌না— রাইচরণের ভগ্নী ইহার নাম রাখিয়াছিল ফেল্‌না— যথাসময়ে পিসিকে পিচি বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল— 'তবে তো খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই। সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।'

তখন মাঠাকরুনের সেই দারুণ সন্দেহের কথা হঠাৎ মনে পড়িল— আশ্চর্য হইয়া মনে মনে কহিল, 'আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে।' তখন, এতদিন শিশুকে যে অযত্ন করিয়াছে সেজন্য বড়ো অনুতাপ উপস্থিত হইল। শিশুর কাছে আবার ধরা দিল।

এখন হইতে ফেল্‌নাকে রাইচরণ এমন করিয়া মানুষ করিতে লাগিল যেন সে বড়ো ঘরের ছেলে। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল। জরির টুপি আনিল। মৃত স্ত্রীর গহনা গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারি হইল। পাড়ার কোনো ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না— রাত্রিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলার সঙ্গী হইল। পাড়ার ছেলেরা সুযোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এইরূপ উন্মত্তবৎ আচরণে আশ্চর্য হইয়া গেল।

ফেল্‌নার যখন বিদ্যাভ্যাসের বয়স হইল তখন রাইচরণ নিজের জোতজমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতায় লইয়া গেল। সেখানে বহুকষ্টে একটি চাকরির জোগাড় করিয়া ফেল্‌নাকে বিদ্যালয়ে

পাঠাইল। নিজে যেমন-তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ভালো শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিত না। মনে মনে বলিত, 'বৎস, ভালোবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোনো অযত্ন হইবে, তা হইবে না।'

এমনি করিয়া বারো বৎসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে-শুনে ভালো এবং দেখিতে-শুনিতেও বেশ, হৃষ্টপুষ্ট উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ— কেশবেশবিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, মেজাজ কিছু সুখী এবং শৌখিন। বাপকে ঠিক বাপের মতো মনে করিতে পারিত না। কারণ, রাইচরণ স্নেহে বাপ এবং সেবায় ভৃত্য ছিল, এবং তাহার আর-একটি দোষ ছিল— সে যে ফেল্‌নার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে ছাত্রনিবাসে ফেল্‌না বাস করিত সেখানকার ছাত্রগণ বাঙাল রাইচরণকে লইয়া সর্বদা কৌতুক করিত, এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেল্‌নাও যে সেই কৌতুকালাপে যোগ দিত না তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বৎসলস্বভাব রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড়ো ভালোবাসিত, এবং ফেল্‌নাও ভালোবাসিত, কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, ঠিক বাপের মতো নহে, তাহাতে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজকর্মে সর্বদাই দোষ ধরে। বাস্তবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কাজেও তেমন মন দিতে পারে না, কেবলই ভুলিয়া যায়— কিন্তু যে ব্যক্তি পুরা বেতন দেয় বার্ধক্যের ওজর সে মানিতে চাহে না। এ দিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ফেল্‌না আজকাল বসনভূষণের অভাব লইয়া সর্বদা খুঁৎখুঁৎ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন রাইচরণ হঠাৎ কর্মে জবাব দিল এবং ফেল্‌নাকে কিছু টাকা দিয়া বলিল, "আবশ্যক পড়িয়াছে, আমি কিছুদিনের মতো দেশে যাইতেছি।" এই বলিয়া বারাসতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুকূলবাবু তখন সেখানে মুন্সেফ ছিলেন।

অনুকূলের আর দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, গৃহিণী এখনও সেই পুত্রশোক বক্ষের মধ্যে লালন করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাবু কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কর্ত্রী একটি সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্তানকামনায় বহুমূল্যে একটি শিকড় ও আশীর্বাদ কিনিতেছেন— এমন সময়ে প্রাঙ্গণে শব্দ উঠিল, "জয় হোক, মা।"

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে।"

রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "আমি রাইচরণ।"

বৃদ্ধকে দেখিয়া অনুকূলের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্ন এবং আবার তাহাকে কর্মে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিলেন।

রাইচরণ ম্লান হাস্য করিয়া কহিল, "মাঠাকরুনকে একবার প্রণাম করিতে চাই।"

অনুকূল তাহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মাঠাকরুন রাইচরণকে তেমন প্রসন্নভাবে সমাদর করিলেন না— রাইচরণ তৎপ্রতি লক্ষ না করিয়া জোড়হস্তে কহিল, "প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইয়াছিলাম। পদ্মাও নয়, আর কেহও নয়, কৃতঘ্ন অধম এই আমি—"

অনুকূল বলিয়া উঠিলেন, "বলিস কী রে। কোথায় সে।"

"আজ্ঞা, আমার কাছেই আছে, আমি পরশ্ব আনিয়া দিব।"

সেদিন রবিবার, কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্ত্রীপুরুষে দুইজনে উন্মুখভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। দশটার সময় ফেল্‌নাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনুকূলের স্ত্রী কোনো প্রশ্ন কোনো বিচার না করিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া, অতৃপ্তনয়নে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক ছেলেটি দেখিতে বেশ— বেশভূষা আকার-প্রকারে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণ নাই। মুখে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলজ্জ ভাব। দেখিয়া অনুকূলের হৃদয়েও সহসা স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনো প্রমাণ আছে?"

রাইচরণ কহিল, "এমন কাজের প্রমাণ কী করিয়া থাকিবে। আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান জানেন, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।"

অনুকূল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ছেলেটিকে পাইবামাত্র তাঁহার স্ত্রী যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহাকে আগলাইয়া ধরিয়াছেন এখন প্রমাণ-সংগ্রহের চেষ্টা করা সুযুক্তি নহে; যেমনই হউক, বিশ্বাস করাই ভালো। তা ছাড়া, রাইচরণ এমন ছেলেই বা কোথায় পাইবে। এবং বৃদ্ধ ভৃত্য তাঁহাকে অকারণে প্রতারণাই বা কেন করিবে।

ছেলেটির সহিতও কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে, সে শিশুকাল হইতে রাইচরণের সহিত আছে এবং রাইচরণকে সে পিতা বলিয়া জানিত,

কিন্তু রাইচরণ কখনও তাহার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভৃত্যের ভাব ছিল।

অনুকূল মন হইতে সন্দেহ দূর করিয়া বলিলেন, "কিন্তু রাইচরণ, তুই আর আমাদের ছায়া মাড়াইতে পাইবি না।"

রাইচরণ করজোড়ে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল, "প্রভু, বৃদ্ধবয়সে কোথায় যাইব।"

কর্ত্রী বলিলেন, "আহা, থাক্। আমার বাছার কল্যাণ হউক। ওকে আমি মাপ করিলাম।"

ন্যায়পরায়ণ অনুকূল কহিলেন, "যে কাজ করিয়াছে উহাকে মাপ করা যায় না।"

রাইচরণ অনুকূলের পা জড়াইয়া কহিল, "আমি করি নাই, ঈশ্বর করিয়াছেন।"

নিজের পাপ ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা দেখিয়া অনুকূল আরও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়।"

রাইচরণ প্রভুর পা ছাড়িয়া কহিল, "সে আমি নয়, প্রভু।"

"তবে কে।"

"আমার অদৃষ্ট।"

কিন্তু এরূপ কৈফিয়তে কোনো শিক্ষিত লোকের সন্তোষ হইতে পারে না।

রাইচরণ বলিল, "পৃথিবীতে আমার আর কেহ নাই।"

ফেল্‌না যখন দেখিল, সে মুন্সেফের সন্তান, রাইচরণ তাহাকে এতদিন চুরি করিয়া নিজের ছেলে বলিয়া অপমানিত করিয়াছে, তখন তাহার মনে মনে কিছু রাগ হইল। কিন্তু তথাপি উদারভাবে পিতাকে

বলিল, "বাবা, উহাকে মাপ করো। বাড়িতে থাকিতে না দাও, উহার মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়া দাও।"

ইহার পর রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল; তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে কোনো লোক নাই।

লক্ষ্মীর

শরৎকুমারী চৌধুরাণী

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার আবশ্যকতা বুঝিলে কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য যাইতে হয় না। মহিলাগণ নিজে নিজেই ঘরে ঘরে সে ব্যবস্থা করিতে পারেন। আমরা স্বভাবতঃ এক হিসাবে অপরিষ্কার। 'বিছানা শেজ' মাসান্তেও ধোপার বাড়ী যায় না, এমন গৃহস্থ বিস্তর। পরিধেয় বসন নিত্য তিন-চার বার ধোয়া হয়, কিন্তু মলিনতার দিকে দৃষ্টি আদপে আমাদের নাই। অনেকে বলিবেন যে, "আমরা চব্বিশ ঘণ্টা রান্নাবান্না নিয়া, ছেলেপিলে নিয়া ব্যস্ত থাকি; আমরা গরিব মানুষ— আমাদের মেম সাজিবার অবসরও নাই, অত ধোপার কড়ি দিবার পয়সাও নাই।" এক কথায় ইহা সকলেরই সংগত মনে হইবে। কিন্তু আলোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে, অবসর বা অভাবের জন্য যে আমরা সর্বদা অপরিচ্ছন্ন থাকি, তাহা নহে; সে দিকে আমাদের দৃষ্টি নাই বলিয়াই আমরা অপরিচ্ছন্ন থাকি।

ছেলেবেলা গল্প শুনিয়াছি, রাজকন্যা 'গোসা'-ঘরে গিয়া শয়ন করিয়া আছেন শুনিয়া রাজরানী অস্থির— "কেন মা, তুমি রাগ করিয়া কাঁদিতেছ কেন?" অনেক সাধ্যসাধনায় রাজকন্যা বলিলেন, "আমার ধুলামুঠি কাপড় চাই।" তখন রাজা ও রানী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তুমি আমাদের সর্বস্ব— সাত রাজার ধন এক মানিক, আর যা চাও তাই দিব, কিন্তু ধুলামুঠি কাপড় দিতে পারিব না।" এই কথার অর্থ এই যে শিশু খেলা করিতে করিতে অপরিষ্কার হাতে মুঠা করিয়া কাপড় ধরিবে, সেই অপরিষ্কার কাপড় তিনি চাহেন, অর্থাৎ তাঁহার সন্তান হয় নাই, তাই মনঃকষ্ট। অতএব দেখা যাইতেছে, শিশু সন্তান ঘরে থাকিলেই ঘর দ্বার, পরিধেয় বসন প্রভৃতি অপরিষ্কার অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এবং ইহাও সত্য যে, রাজকন্যা যে 'ধুলামুষ্টি কাপড়' পরিতেন, তাহা অসচ্ছলতাবশতঃ নহে— অভ্যাসবশতঃ।

এই যে সর্বদা অপরিচ্ছন্ন থাকা আমাদের অভ্যাস, ইহা আমাদের বহু দিনের। ধনিগৃহেও ইহার প্রচলন খুব বেশী। প্রচুর দাসদাসী থাকিলেও, ঘর দ্বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেও বিছানা বা শিশু সন্তানের কাপড়-চোপড় বা মহিলাদের বসন সর্বদা মলিন দেখা যায়। অনেক সুশিক্ষিত ভদ্রলোকের এখনও এমন বিশ্বাস যে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেই সে 'বাবু'— সে 'অকর্মণ্য'। সামান্য আয়াসেই যে পরিচ্ছন্ন থাকা যায়— ইহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। রেলওয়ে স্টেশনের ধারে ধারে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মচারীদের বাসা দেখা যায়, তাহা দেখিবা মাত্রই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহাতে বাঙ্গালী অথবা ফিরিঙ্গী বসবাস করিতেছেন। সেই একই বাড়ীতে কখনও বাঙ্গালী, কখনও ফিরিঙ্গী বাস করেন— কিন্তু ফিরিঙ্গী হইলেও তাহার শ্রী ও পরিচ্ছন্নতা সকলের দৃষ্টি যে বিশেষ করিয়া আকর্ষণ করে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

এই ফিরিঙ্গী যে ধনী এবং তাঁহার দাসদাসী যে অনেক, তাহা নহে—কেবল অভ্যাসবশেই তাঁরা পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারেন। অভাব যদি অপরিচ্ছন্নতার মূল হইত, তবে ধনিগৃহে অপরিচ্ছন্নতা দেখা যাইত না। আমাদের একটি ধনী আত্মীয়া মহিলা সর্বদা দুই তিন সের সোনার গহনা পরিধান করিয়া থাকিতেন— কিন্তু মলিন বস্ত্রের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার সন্তানাদি ছিল না, তথাপি আমি কখনও পরিষ্কার বস্ত্র পরিতে দেখি নাই। কেবল এক দিন কোন নিমন্ত্রণস্থলে প্রচুর অলংকার ও বহুমূল্য বারাণসী বস্ত্রে ভূষিত দেখিয়াছিলাম। আমাদের দেশে অপরিচ্ছন্নতা অর্থাৎ মলিন বস্ত্র পরিধান বিনয়ের লক্ষণ। মহিলাগণ নিমন্ত্রণে বারাণসী, বোম্বাই, সিল্ক প্রভৃতির শাড়ি পরিয়া গিয়াছেন—বসিবার জন্য আসন দিবার অপেক্ষা করিয়া থাকা অসম্ভব— 'বড়মানুষি'র পরিচায়ক; অতএব পরিধেয় বসন যতই বহুমূল্য হউক না কেন, ধুপ্ করিয়া যেখানে সেখানে বসিয়া না পড়িলে নিন্দার ভাজন হইতে হয়। এই সকল ভাবিলে দেখা যায় যে, অপরিচ্ছন্নতা আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। আচার-অনুষ্ঠানের ত্রুটির দিকে যেমন আমাদের খর দৃষ্টি, অপরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি একেবারেই নাই। উঠানের এক কোণে নিকানো পোঁছানো তুলসীমঞ্চ— আর এক কোণে আবর্জনার রাশি। সে আবর্জনা যদি প্রতি দিন বেড়ার ও-পারে ফেলা হইত, তবে উঠানটি ত পরিষ্কার থাকিত। ইহাতে কিছুমাত্র ব্যয় হইত না। মুষ্টি মুষ্টি আবর্জনা জমা হইয়া এখন একটা ভূতের বোঝা হইয়াছে, এখন আর পয়সা-ব্যয় ভিন্ন পরিষ্কার হয় না।

পরিধেয় বসন সর্বদা অল্প আয়াসেই পরিষ্কার যে রাখা যায়, তাহা অনেকেই জানেন। প্রত্যহ নিয়মিত শিশুদের ও নিজেদের কাপড়গুলি যদি শুধু 'জল কাচা'র পরিবর্তে একটু সাবান দিয়া লওয়া হয়, তবে সর্বদা

পরিষ্কার থাকে। যথেষ্ট ময়লা না হইলে সামান্য সাবান ও অল্প সময়েই কাপড় পরিষ্কার হয়। অনেক মহিলাকে দেখা যায়, সন্তানদের জামাটা কিংবা ধুতিখানা লইয়া ছেলেকে দুধ খাওয়াইতে বসিলেন, তার পর তাহাতে দুধ মোছা, কাদা মোছা, শেষে ঘরসুদ্ধ মোছা হইল— তার পর জলে ধুইয়া দেওয়া হইল, পরদিন আবার বালক তাহাই পরিবে। এই প্রকারে যে বস্ত্র ময়লা হয়, তাহা শুধু জলে কেন, ধোপার বাড়ি গিয়াও ভালরূপ সাদা হয় না। অতএব কাপড়গুলি যাহাতে যত কম ময়লা হয়, প্রথমে পরিবারস্থ সকলের সে দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। জামাকাপড়ে কোন মতেই কাদা ধুলা পোঁছা উচিত নহে। অনেক মহিলার আঁচলে হাত মোছা অভ্যাস আছে। তরকারি খাইয়া, হাত ধুইয়া আঁচলে হাত মুছিলে তেল ঘি হলুদ কাপড়ে মাখামাখি হয়। এ সকল পরিহার করা কর্তব্য। তার পর নিত্য স্নানের সময় নিজ নিজ পরিধেয় বসন ও শিশু সন্তানদের কাপড়গুলি নিয়মিত সাবান দিয়া ধুইয়া দিলে বিশেষ সময় বা পয়সা ব্যয় হয় না। প্রত্যহ এক পয়সার সাবানে চার পাঁচখানা বড় ধুতি ও ছোট ছোট তোয়ালে রুমাল মোজা প্রভৃতি পাঁচ সাতখানা অনায়াসে ধুইয়া লওয়া যায়। ইহাতে ধোপার ব্যয়ও কমানো যায়। যাঁহাদের দাসদাসীর অপ্রতুল নাই, তাঁহারা নিয়মিত দাসদাসীদের দ্বারা সাবান দিয়া কাপড় ধোয়াইতে পারেন। তবে যাঁহারা মনে করেন যে, সাবানের একটা পয়সা থাকিলে মোহনভোগ কিনিয়া দিব, এবং যত ক্ষণ কাপড় ধুইব তত ক্ষণ একটু গড়াইয়া বাঁচিব, তাঁহাদের প্রতি নিবেদন এই যে, সাবধানে সাবান খরচ করিলে একখানা বার-সোপে এক মাস চালানো যায়। কি ধনী কি দরিদ্র, ভাত সকল ঘরেই রান্না হয়। এই ভাতের ফেনে একটু সাবান ফেলিয়া গুলিয়া তাহাতে চার পাঁচখানা কাপড় বেশ পরিষ্কার হয়। একটু গরম গরম আছড়াইয়া লইলে শীঘ্র ময়লা দূর হয়।

সকলেই অনুভব করিতে পারেন যে, যে দিন ধোপা আসে, সে দিন বেশ একটু স্বচ্ছন্দতা অনুভব করা যায়— মনটা প্রফুল্ল হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, মলিনতা অপ্রফুল্লকর।

অতি শিশুকাল হইতে মলিনতার দিকে যদি শিশু সন্তানের ঘৃণা জন্মাইয়া দেওয়া যায়, তবে ক্রমশঃ বয়ঃবৃদ্ধির সহিত সে আপনিই অপরিচ্ছন্নতা হইতে দূরে থাকিবে। জল ঘাঁটিতে সকল শিশুই ভালবাসে; যে-কোন কিছু আহারের পর হাত ধুইয়া দেওয়া বা হাত ধুইতে বলায় শিশুরা বিরক্ত হয় না। আমরা ভাত-ব্যঞ্জনের বাটিটা যদি স্পর্শ করি, তাহা হইলে হাত ধুইয়া ফেলি; কিন্তু দুধের সরটা হাত দিয়া তুলিয়া বা রসগোল্লাটা ছেলেকে খাওয়াইয়া অনায়াসে কাপড়ে হাতটা মুছিয়া রাখিতে পারি। কারণ, তাহা সকড়ি নহে। এইজন্য সচরাচর দেখা যায়, খাবার খাইয়া ছেলেরা হাত ধোয় না। তার পর সেই হাতে দুনিয়ার জিনিস ধরে। শিশু কাল হইতে এই সকলে ঘৃণা জন্মাইলে বালক-বালিকা আপনা-আপনি ধুলাকাদা হইতে পরিধেয় বস্ত্রাদি রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। চার পাঁচ বৎসরের বালক-বালিকা স্নানের সময় অনায়াসে নিজের নিজের কাপড় সাবান দিয়া ধুইয়া দিতে পারে।

একজন গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ কর— বাড়ীর গৃহিণী কেমন, তাহা এক নজরেই বোঝা যায়। সুগৃহিণী যেখানে, সেখানে যখনই যাও, দেখিবে সমস্তই পরিপাটি। আলনার কাপড়গুলি গোছানো থাকিলে যে ঘরের কতখানি শোভা বৃদ্ধি হয়, বিশৃঙ্খলা কতখানি দূর হয়, তাহা সুগৃহিণী বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। বাড়ীর মধ্যের সর্বোৎকৃষ্ট ঘরটিই আমাদের শয়নগৃহ— অতিথি যে-কোন মহিলাই সেইখানে অভ্যর্থনা লাভ করেন। সেই ঘরে গিয়া দেখিবে, এক দিকে একখানা খাট, তার আধখানা মশারি ফেলা, আধখানা তোলা, দু-তিনটা বালিশ এলোমেলো

ভাবে পড়িয়া আছে—একখানা চাদর জড়ো করা আছে, একটি ছেলে ঘুমাইতেছে। ও-ধারে জোড়া তক্তা পাতা, তার এক পাশে কতকগুলা লেপ কাঁথা বালিশ স্তূপাকৃতি, এ-পাশে কতকগুলা ছোট বালিশ, কাঁথা, ছোট ছেলের জামা ছড়ানো, আর এক ধারে আলনার উপর কর্তার কামিজ কোট, গৃহিণীর ডুরে শাড়ি হইতে ছেলেদের সব কাপড়—রাশীকৃত ময়লা ফরসা বিবিধ প্রকারের বস্ত্রের বোঝা। আর দিকে আলমারির মাথায় রাজ্যের বাজে জিনিস—ঘরের মেঝেতে দুধের বাটি, ঝিনুক, শালপাতা, খাবারের গুঁড়া, জল কাদা—ইহার মধ্যে কোন মতে আগন্তুকের স্থান হইল। আর যাহাই হউক, ইহা যে অশোভন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সুগৃহিণীর ঘরে দ্বারে এমন দৃশ্য কোন সময়েই কখনও দেখা যায় না। ঘর দ্বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, মলিনতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করা যে কেবলমাত্র সুগৃহিণীর গৃহিণীপনায় সাধিত হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সকড়ির বিচার ও শুচি আচারের সহিত পরিচ্ছন্নতা মিলিত হইলে আমাদের প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহই সৌন্দর্যময় করিতে পারে। একজন দরিদ্র ফিরিঙ্গী মহিলার ঘরদ্বার যে আমাদের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ঘরদ্বারকে ধিক্কার দিতে পারে, ইহা গৌরবের বিষয় নহে। অশোভনতার দিকে দৃষ্টি পড়িলে অল্প আয়াসে ও স্বল্প ব্যয়ে ঘরে ঘরে পরিচ্ছন্নতা আনিতে পারা যায়। ইহাতে লক্ষ্মীর শ্রীও বৃদ্ধি হয়।

বাঙ্গালা ভাষা

স্বামী বিবেকানন্দ

আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাহাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূত-কিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর— সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে, ও সকল তত্ত্ববিচার কেমন ক'রে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই— তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোন তৈয়ারি ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে— যেন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর— আবার যে কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল— ঐ এক চাল—

নকল ক'রে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।

যদি বল ও কথা বেশ; তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ এক কলকেতার ভাষা। পূর্ব পশ্চিম, যে দিক হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি, সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ ভাষা লিখতে হবে, যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব-পশ্চিমী ভেদ উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত ঐ কলকেতার ভাষাই চলবে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশী নিকট, সে কথা হচ্ছে না— কোন্ ভাষা জিতছে সেইটি দেখ। যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা কওয়া ভাষা এক করতে হয়, ত বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন। এথায় গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে। ভাষা, ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে। হীরে মতির সাজ পরানো ঘোড়ার উপর, বাঁদর বসালে কি ভাল দেখায়? সংস্কৃতর দিকে দেখ দিকি। ব্রাহ্মণের সংস্কৃত দেখ, শবর স্বামীর মীমাংসাভাষ্য দেখ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য দেখ, শেষ— আচার্য শংকরের মহাভাষ্য দেখ; আর অর্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ।— এখুনি বুঝতে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জ্যান্ত-কথা কয়, মরে গেলে, মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুল চন্দন দিয়ে

ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ্ রে, সে কি ধুম— দশ পাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম্ করে—"রাজা আসীৎ" !!! আহাহা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!! — ও সব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হল তখন এই সব চিহ্ন উদয় হল। ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল। বাড়ীটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি; থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষুসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতাপাতা চিত্রবিচিত্রর কি ধুম!! গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে— তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না; আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম! সে কি আঁকাবাঁকা ডামাডোল— ছত্রিশ নাড়ীর টান তায় রে বাপ্। তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব! এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন— সে ভাষা, সে শিল্প, সে সংগীত— কোনও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন বল আসবে, তেমন ভাষা শিল্প সংগীত প্রভৃতি আপনা আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনাপরা মেয়েমাত্রই দেবী ব'লে বোধ হবে, আর বাড়ী ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগ্‌মগ্ করবে।

নিয়মের রাজত্ব

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য, এইরূপ একটা বাক্য আজকাল সর্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানসম্পৃক্ত যে-কোন গ্রন্থ হাতে করিলেই দেখা যাইবে যে লেখা রহিয়াছে, প্রকৃতির রাজ্যে অনিয়মের অস্তিত্ব নাই; সর্বত্রই নিয়ম, সর্বত্রই শৃঙ্খলা।· · মনুষ্যের রাজ্যে আইন আছে বটে, এবং সেই আইন ভঙ্গ করিলে শাস্তিরও ব্যবস্থা আছে; কিন্তু অনেকেই আইনকে ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভ করে। কিন্তু বিশ্বজগতে অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যে যে সকল আইনের বিধান বর্তমান, তাহার একটাকেও ফাঁকি দিবার জো নাই। কোথাও ব্যভিচার নাই; কোথাও ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি-লাভের উপায় নাই। কাজেই প্রাকৃতিক নিয়মের জয়গান করিতে গিয়া অনেকে পুলকিত হন, ভাবাবেশে গদ্‌গদকণ্ঠ হইয়া থাকেন, তাঁহাদের দেহে বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়।

যাঁহারা 'মিরাক্‌ল্' বা অতিপ্রাকৃত মানেন, তাঁহারা সকল সময়ে এই নিয়মের অব্যভিচারিতা স্বীকার করেন না, অথবা প্রকৃতিতে নিয়মের রাজত্ব স্বীকার করিলেও অতিপ্রাকৃত শক্তি সময়ে সময়ে সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়, এইরূপ স্বীকার করেন। যাঁহারা মিরাক্‌ল্ মানিতে চাহেন না তাঁহারা প্রতিপক্ষকে মিথ্যাবাদী নির্বোধ পাগল ইত্যাদি মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করেন।· ·

বর্তমান অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে নূতন করিয়া গম্ভীরভাবে একটা সন্দর্ভ লিখিবার সময় গিয়াছে, এরূপ মনে না করিলেও চলিতে পারে।

প্রাকৃতিক নিয়ম কাহাকে বলে? দুই-একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করা যাইতে পারে। গাছ হইতে ফল চিরকালই ভূমিপৃষ্ঠে পতিত হয়। এ পর্যন্ত যত গাছ দেখা গিয়াছে ও যত ফল দেখা গিয়াছে, সর্বত্রই এই নিয়ম। যে দিন লোষ্ট্রপাতিত আম্র ভূপৃষ্ঠ অন্বেষণ না করিয়া আকাশমার্গে ধাবিত হইবে সেই ভয়াবহ দিন মনুষ্যের ইতিহাসে বিলম্বিত হউক।

ফলে— আম বল, জাম বল, নারিকেল বল, সকলেই অধোমুখে ভূমিতে পড়ে, কেহই ঊর্ধ্বমুখে আকাশপথে চলে না। কেবল আম জাম নারিকেল কেন, যে-কোন দ্রব্য ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপ কর না, তাহাই কিছুক্ষণ পরে ভূমিতে নামিয়া আসে। এই সাধারণ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম এ পর্যন্ত দেখা যায় নাই।

অতএব ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। পার্থিব দ্রব্যমাত্রই ভূকেন্দ্রাভিমুখে গমন করিতে চাহে। এই নিয়মের নাম ভৌম আকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণ।

প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মভঙ্গ হয় না; কাজেই যদি কেহ আসিয়া বলে, দেখিয়া আসিলাম, অমুকের গাছে নারিকেল আজ বৃন্তচ্যুত হইবামাত্র ক্রমেই বেলুনের মত উপরে উঠিতে লাগিল, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই হতভাগ্য ব্যক্তির উপর বিবিধ নিন্দাবাদ বর্ষিত হইতে থাকিবে। কেহ বলিবে— লোকটা মিথ্যাবাদী; কেহ বলিবে— লোকটা পাগল; কেহ বলিবে— লোকটা গুলি খায়; এবং যিনি সম্প্রতি রসায়ন-নামক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন, তিনি হয়ত বলিবেন, হইতেও-বা পারে, বুঝি ঐ নারিকেলটার ভিতরে জলের পরিবর্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ছিল। কেননা তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস যে, নারিকেল— খাটি নারিকেল, যাহার ভিতরে জল আছে, হাইড্রোজেন নাই, এ-হেন নারিকেল কখনই প্রাকৃতিক নিয়মভঙ্গে অপরাধী হইতে পারে না।

খাঁটি নারিকেল নিয়মভঙ্গ করে না বটে, হাইড্রোজেন-পূর্ণ বোম্বাই নারিকেল নিয়মভঙ্গ করিতে পারে। আম ভূমিতে পড়ে, কিন্তু মেঘ বায়ুতে ভাসে; প্যারাস্থুট-বিলম্বিত আরোহী নীচে নামে বটে, কিন্তু বেলুনটা উপরে উঠে।

তবে এইখানে বুঝি নিয়মভঙ্গ হইল। পূর্বে এক নিশ্বাসে নিয়ম বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, পার্থিব দ্রব্যমাত্রই নিম্নগামী হয়; কিন্তু এখানে দেখিতেছি, নিয়মের ব্যভিচার আছে; যথা মেঘ, বেলুন ও হাইড্রোজেন-পোরা বোম্বাই নারিকেল। লোহা জলে ডুবে, কিন্তু শোলা জলে ভাসে। কাজেই প্রকৃতির নিয়মে এইখানে ব্যভিচার।

অপর পক্ষ হটিবার নহেন; তাঁহারা বলিবেন, তা কেন, নিয়ম ঠিক আছে, পার্থিব দ্রব্যমাত্রেই নীচে নামে, এরূপ নিয়ম নহে। দ্রব্যমধ্যে জাতিভেদ আছে। গুরু দ্রব্য নীচে নামে, লঘু দ্রব্য উপরে উঠে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। লোহা গুরু দ্রব্য, তাই জলে ডুবে; শোলা লঘু দ্রব্য, তাই জলে ভাসে; ডুবাইয়া দিলেও উপরে উঠে। নারিকেল গুরু দ্রব্য; উহা নামে। কিন্তু বেলুন লঘু দ্রব্য; উহা উঠে।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম খুঁজিয়া বাহির করা বস্তুতই কঠিন। কার সাধ্য ঠকায়? ঐ জিনিসটা উপরে উঠিতেছে কেন? উত্তর, এটা যে লঘু। ঐ জিনিসটা নামিতেছে কেন? উত্তর, ওটা যে গুরু। যাহা লঘু, তাহা ত উঠিবেই; যাহা গুরু, তাহা ত নামিবেই; ইহাই ত প্রকৃতির নিয়ম।

সোজা পথে আর উত্তর দিতে পারা যায় না; বাঁকা পথে যাইতে হয়। লোহা গুরু দ্রব্য; কিন্তু খানিকটা পারার মধ্যে ফেলিলে লোহা ডুবে না। ভাসিতে থাকে। শোলা লঘু দ্রব্য; কিন্তু জল হইতে তুলিয়া

উর্ধ্বমুখে নিক্ষেপ করিলে ঘুরিয়া ভূতলগামী হয়। তবেই ত প্রাকৃতিক নিয়মের ভঙ্গ হইল।

উত্তর— আরে মূর্খ, গুরু লঘু শব্দের অর্থ বুঝিলে না। গুরু মানে এখানে পাঠশালার গুরুমহাশয় নহে বা মন্ত্রদাতা গুরুও নহে; গুরু অর্থে অমুক পদার্থ অপেক্ষা গুরু অর্থাৎ ভারী। লোহা গুরু, তার অর্থ এই যে, লোহা বায়ু অপেক্ষা গুরু, জল অপেক্ষা গুরু; কাজেই বায়ুমধ্যে, কি জলমধ্যে রাখিলে লোহা না ভাসিয়া ডুবিয়া যায়। আর লোহা পারার অপেক্ষা লঘু; সমান আয়তনের লোহা ও পারা নিক্তিতে ওজন করিলেই দেখিবে, কে লঘু, কে গুরু। পারা অপেক্ষা লোহা লঘু, সে জন্য লোহা পারায় ভাসে। প্রাকৃতিক নিয়মটার অর্থই বুঝিলে না, কেবল তর্ক করিতে আসিতেছ।

এ পক্ষ বলিতে পারেন, আপনার বাক্যের অর্থ যদি বুঝিতে না পারি, সে ত আমার বুদ্ধির দোষ নহে, আপনার ভাষার দোষ। গুরু দ্রব্য নামে, লঘু দ্রব্য উঠে, বলিবার পূর্বে গুরু লঘু কাহাকে বলে, আমাকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। আপনার আইনের ভাষা-যোজনায় দোষ ঘটিয়াছে; উহার সংশোধন আবশ্যক।

ভাষা-সংশোধনের পর প্রাকৃতিক আইনের সংশোধিত ধারাটা দাঁড়াইবে এই রকম:

ধারা।—কোন দ্রব্য অপর তরল বা বায়বীয় দ্রব্যমধ্যে রাখিলে প্রথম দ্রব্য যদি দ্বিতীয় দ্রব্য অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে নিম্নগামী হইবে, আর যদি লঘু হয়, তাহা হইলে উর্ধ্বগামী হইবে।

ব্যাখ্যা।—এক দ্রব্য অন্য দ্রব্য অপেক্ষা গুরু কি লঘু, তাহা উভয়ের সমান আয়তন লইয়া নিক্তিতে ওজন করিয়া দেখিতে হইবে।

উদাহরণ।—রাম প্রথম দ্রব্য, শ্যাম দ্বিতীয় দ্রব্য। রামকে শ্যামের

আয়তন-মত ছাঁটিয়া লইয়া তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখ, রাম যদি শ্যাম অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে শ্যামের মধ্যে রামকে রাখিলে রাম নিম্নগামী হইবে। শ্যামকে তরল পদার্থ মনে করিতে আপত্তি করিও না।

সংশোধনের পর আইনের ভাষা অত্যন্ত সুবোধ্য হইয়া দাঁড়াইল, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

এখন দেখা যাউক, কতদূর দাঁড়াইল। পার্থিব দ্রব্যমাত্রই ভূমি স্পর্শ করিতে চাহে, নিম্নগামী হয়; ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম নহে। সুতরাং উহার ব্যভিচার দেখিলে বিস্মিত হইবার হেতু নাই; পার্থিব দ্রব্য অবস্থাবিশেষে, অর্থাৎ অন্য পার্থিব বস্তুর সন্নিধানে কখন-বা উপরে উঠে, কখন-বা নীচে নামে। যখন অন্য কোন বস্তুর সন্নিধানে থাকে না, তখন সকল পার্থিব দ্রব্য নীচে নামে। যেমন শূন্যপ্রদেশে, "পাম্প" যোগে কোন প্রদেশকে জলশূন্য ও বায়ুশূন্য করিয়া সেখানে যে-কোন দ্রব্য রাখিবে, তাহাই নিম্নগামী হইবে। আর বায়ুমধ্যে, জলমধ্যে, তেলের মধ্যে, পারদমধ্যে কোন জিনিস রাখিলে তখন লঘু গুরু বিচার করিতে হইবে। ফলে ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম; ইহার ব্যভিচার নাই। এই অর্থে প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য।

তবে, যত দোষ এই জলের আর তেলের আর পারার আর বাতাসের! উহাদের সন্নিধিই এই বিষম সংশয়-উৎপাদনের হেতু হইয়াছিল। ভাগ্যে মনুষ্য বুদ্ধিজীবী, তাই প্রকৃত দোষীর সন্ধান করিতে পারিয়াছে; নতুবা প্রকৃতিতে নিয়মের প্রভুত্বটা গিয়াছিল আর কি!

বাস্তবিকই দোষ এই তরল পদার্থের ও বায়বীয় পদার্থের। বেলুন উপরে উঠে, বায়ু আছে বলিয়া; শোলা জলে ভাসে, জল আছে বলিয়া; লোহা পারায় ভাসে, পারা আছে বলিয়া;— নতুবা সকলেই ডুবিত, কেহই ভাসিত না; সকলেই নামিত, কেহই উঠিত না।

অর্থাৎ কিনা, পৃথিবী যেমন সকল দ্রব্যকেই কেন্দ্রমুখে আনিতে চায়, তরল ও বায়বীয় পদার্থ মাত্রেই তেমনি মগ্ন দ্রব্যমাত্রকেই উপরে তুলিতে চায়। প্রথম ব্যাপারের নাম দিয়াছি মাধ্যাকর্ষণ; দ্বিতীয় ব্যাপারের নাম দাও চাপ। মাধ্যাকর্ষণে নামায়, চাপে ঠেলিয়া উঠায়। যেখানে উভয় বর্তমান, সেখানে উভয়ই কার্য করে। যার যত জোর। যেখানে আকর্ষণ চাপ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর নামিতে হয়; যেখানে চাপ আকর্ষণ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর উঠিতে হয়। যেখানে উভয়ই সমান, সেখানে "ন যযৌ ন তস্থৌ"।

এখন এ পক্ষ স্পর্ধা করিয়া বলিবেন— দেখিলে, প্রাকৃতিক নিয়মের আর ব্যতিক্রম আছে কি? আমাদের প্রকৃতির রাজ্যে কি কেবল একটা নিয়ম; কেবলই কি একটা আইন? অনেক নিয়ম ও অনেক আইন, অথবা একই আইনের অনেক ধারা। যথা—

১ নং ধারা—পার্থিব আকর্ষণে বস্তুমাত্রই নিম্নগামী হয়।

২ নং ধারা—তরল বা বায়বীয় পদার্থের চাপে বস্তুমাত্রই উর্ধ্বগামী হয়।

৩ নং ধারা—আকর্ষণ ও চাপ উভয়ই যুগপৎ কাজ করে। আকর্ষণ প্রবল হইলে নামায়, চাপ প্রবল হইলে উঠায়।

কাহার সাধ্য, এখন বলে যে, প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার আছে? উঠিলেও নিয়ম, নামিলেও নিয়ম, স্থির থাকিলেও নিয়ম; নিয়ম কাটাইবার জো নাই। প্রকৃতির রাজ্য বস্তুতই নিয়মের রাজ্য। নারিকেল-ফল যে নিয়ম লঙ্ঘন করে না, তাহা যে দিন হইতে নারিকেল-ফল মনুষ্যের ভক্ষ্য হইয়াছে, তদবধি সকলেই জানে। বেলুন যে উর্ধ্বগামী হইয়াও নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিল না, তাহাও দেখা গেল। কেননা, পৃথিবীর আকর্ষণ উভয় স্থলেই বিদ্যমান।

ভরত

দীনেশচন্দ্র সেন

ভরতের উল্লেখ করিয়া রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন—

"রামাদপি হি তং মন্যে ধর্মতো বলবত্তরম্।"

ভরতের চরিত্র তিনি বিলক্ষণরূপ অবগত ছিলেন, তথাপি রাম বন-গমন করিলে তাঁহাকে ত্যাজ্যপুত্র ও স্বীয় ঔর্ধ্বদৈহিক কার্যের অযোগ্য বলিয়া নির্দেশ করেন। এমন নির্দোষ— শুধু নির্দোষ বলিলে ঠিক হয় না, রামায়ণকাব্যে একমাত্র আদর্শচরিত্র ভরতের ভাগ্যে যে কি বিড়ম্বনা ঘটিয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে আমরা দুঃখিত হই। রাম বনবাসোপলক্ষে অযোধ্যার রাজগৃহে যে ভয়ানক বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেও দুই এক বার এই নির্দোষ রাজকুমারের প্রতি অন্যায় কটাক্ষপাত হইয়াছে। প্রজাগণ রামের বনবাসকালে—

"ভরতে সন্নিবদ্ধাঃ স্ম শৌনিকে পশবো যথা।"

"আমরা ঘাতক-সন্নিধানে পশুর ন্যায় ভরতের নিকট নিবদ্ধ হইলাম" এই বলিয়া আর্তনাদ করিয়াছিল। এই সাধু ব্যক্তি নিতান্ত আত্মীয়-গণের নিকট হইতেও অতি অন্যায় লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র ভরতকে এত ভালবাসিতেন যে, "মম প্রাণৈঃ প্রিয়তরঃ" বলিয়া তিনি বারংবার ভরতের উল্লেখ করিয়াছেন। কৌশল্যাকে রাম বলিয়া-ছিলেন, "ধর্মপ্রাণ ভরতের কথা মনে করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় রাখিয়া যাইতে আমার কোন চিন্তার কারণ নাই।" অথচ সেই রামচন্দ্রও ভরতের প্রতি দুই একটি সন্দেহের বাণ নিক্ষেপ না করিয়াছেন, এমন নহে। তিনি সীতার নিকট বলিয়াছিলেন, "তুমি ভরতের নিকট

আমার প্রশংসা করিও না— ঋদ্ধিযুক্ত পুরুষেরা পরের প্রশংসা শুনিতে ভালবাসেন না।"· · পিতা দশরথ রামাভিষেকের উদ্‌যোগের সময়ে ভরতকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, রামকে তিনি আহ্বান করিয়া আনিয়া বলিয়াছিলেন, "ভরত মাতুলালয়ে থাকিতে থাকিতেই তোমার অভিষেক সম্পন্ন হইয়া যায়, ইহাই আমার ইচ্ছা; কারণ, যদিও ভরত ধার্মিক ও তোমার অনুগত, তথাপি মনুষ্যের মন বিচলিত হইতে কতক্ষণ!" ইক্ষ্বাকু-বংশের চিরাগত প্রথানুসারে সিংহাসন জ্যেষ্ঠভ্রাতারই প্রাপ্য; এমত অবস্থায় ধার্মিকাগ্রগণ্য ভরতের প্রতি এই সন্দেহের মার্জনা নাই। রাম ভরতের চরিত্র-মাহাত্ম্য এত বুঝিতেন, তথাপি বনবাসান্তে ভরদ্বাজাশ্রম হইতে হনুমান্‌কে ভরতের নিকট পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন, "আমার প্রত্যাগমন-সংবাদ শুনিয়া ভরতের মুখে কোন বিকৃতি হয় কি না, তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিও।" এই সন্দেহও একান্ত অমার্জনীয়। জগতে নিরপরাধের দণ্ড অনেকবার হইয়াছে, কিন্তু ভরতের মত আদর্শ ধার্মিকের প্রতি এইরূপ দণ্ডের দৃষ্টান্ত বিরল।· ·

কৌশল্যা ভরতকে ডাকিয়া আনিয়া কটুবাক্য বলিতে লাগিলেন, এই সকল বাক্যে, ব্রণে সূচিকা বিদ্ধ করিলে যেরূপ কষ্ট হয়, ভরতকে সেইরূপ বেদনা দিয়াছিল। দৈবচক্রে পড়িয়া এই দেবতুল্যচরিত্র বিশ্বের সকলের সন্দেহের ভাজন হইয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিপুল বাহিনী-সঙ্গে যখন অগ্রসর হইতেছিলেন, নিষাদাধিপতি গুহক তখন তাঁহাকে রামের অনিষ্টকামনায় ধাবিত মনে করিয়া পথে লগুড়ধারণপূর্বক দাঁড়াইয়াছিলেন, এমন কি ভরদ্বাজ ঋষি পর্যন্ত তাঁহাকে ভয়ের চক্ষে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি সেই নিষ্পাপ রাজপুত্রের প্রতি কোন পাপ অভিপ্রায় বহন করিয়া ত যাইতেছেন না?" প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত দিতে দিতে ভরতের প্রাণ

ওষ্ঠাগত হইতেছিল। ভরতের চিত্র প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে কবিগুরু যখন সর্বপ্রথম যবনিকা উত্তোলন করেন, তখনই তাঁহার মূর্তি বিষণ্ণতাপূর্ণ। এইমাত্র দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়াছেন। নর্তকীগণ তাঁহার প্রমোদের জন্য সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, বন্ধুগণ ব্যগ্রভাবে কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ভরতের চিত্ত ভারাক্রান্ত, মুখখানি শ্রীহীন। অযোধ্যার বিষম বিপদের পূর্বাভাস যেন তাঁহার মন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তিনি কোন রূপেই স্বস্থ হইতে পারিতেছেন না। এই সময়ে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য অযোধ্যা হইতে দূত আসিল। ব্যগ্রকণ্ঠে ভরত দূতগণকে অযোধ্যার প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। দূতগণ দ্ব্যর্থব্যঞ্জক উত্তরে বলিল—

"কুশলাস্তে মহাবাহো যেষাং কুশলমিচ্ছসি।"

কিন্তু গত রাত্রের দুঃস্বপ্ন ও দূতগণের ব্যগ্রতা তাঁহার নিকট একটা সমস্যার মত মনে হইল। এই দুই ঘটনা তিনি একটি দুশ্চিন্তার সূত্রে গাঁথিয়া একান্ত বিমর্ষ হইলেন।

. . .

বহু দেশ, নদনদী ও কান্তার অতিক্রম করিয়া ভরত দূর হইতে অযোধ্যার চিরশ্যামল তরুরাজি দেখিতে পাইলেন এবং আতঙ্কিতকণ্ঠে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ যে অযোধ্যার মত বোধ হয় না, নগরীর সেই চিরশ্রুত তুমুল শব্দ শুনিতেছি না কেন? বেদপাঠনিরত ব্রাহ্মণগণের কণ্ঠধ্বনি ও কার্যস্রোতে প্রবাহিত নরনারীর বিপুল হলহলাশব্দ একান্তরূপে নিস্তব্ধ। যে প্রমোদোদ্যানসমূহে রমণী ও পুরুষগণ একত্র বিচরণ করিত, তাহা আজ পরিত্যক্ত। রাজপথ চন্দন ও জল -নিষেকে পবিত্র হয় নাই। রথ, অশ্ব, হস্তী, রাজপথে কিছুই নাই। অসংযত-কবাট ও শ্রীহীন রাজপুরী যেন ব্যঙ্গ করিতেছে; এ ত অযোধ্যা নহে, এ যেন অযোধ্যার অরণ্য।"

প্রকৃতই অযোধ্যার শ্রী অন্তর্হিত হইয়াছে। চাঁদের হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ত্রিলোকবিশ্রুতকীর্তি মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; অভিষেকমঞ্চে পাদোত্তোলনোদ্যত জ্যেষ্ঠ রাজকুমার বিধিশাপে অভিশপ্ত হইয়া পাগলের বেশে বনে গিয়াছেন; বলয়কঙ্কণ-কেয়ুর সখীগণকে বিলাইয়া দিয়া অযোধ্যার রাজবধূ পাগলিনীবেশে স্বামিসঙ্গিনী হইয়াছেন; যাঁহার আয়ত এবং সুবৃত্ত বাহুদ্বয় অঙ্গদ প্রভৃতি সর্বভূষণ ধারণের যোগ্য "সেই সুবর্ণচ্ছবি" লক্ষ্মণ ভ্রাতা ও বধূর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। অযোধ্যার গৃহে গৃহে এই তিন দেবতার জন্য করুণ ক্রন্দনের উৎস প্রবাহিত হইতেছে। বিপণি বন্ধ, রাজপথ পরিত্যক্ত। সুমন্ত্র সত্যই বলিয়াছিলেন, সমস্ত অযোধ্যানগরী যেন পুত্রহীনা কৌশল্যার দশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

সদ্যোবিধবা কৈকেয়ী আনন্দে ফুল্লা, পতিঘাতিনী পুত্রের ভাবী অভিষেক-ব্যাপারের আনন্দের চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করিয়া সুখী হইতেছিলেন। ভরতকে পাইয়া তিনি নিতান্ত হৃষ্টা হইলেন। ভরত পিতার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—

"যা গতিঃ সর্বভূতানাং তাং গতিং তে পিতা গতঃ।"

"সর্বজীবের যে গতি, তোমার পিতা তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছেন।" এই সংবাদে পরশুচ্ছিন্ন বন্যবৃক্ষের ন্যায় ভরত ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।—

"ক্ব স পাণিঃ সুখস্পর্শ স্তাতস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।"

"অক্লিষ্টকর্মা পিতার হস্তের সুখের স্পর্শ কোথায় পাইব?" বলিয়া ভরত কাঁদিতে লাগিলেন। রাজহীন রাজশয্যা তাঁহার নিকট চন্দ্রহীন আকাশের মত বোধ হইল। তিনি কৈকেয়ীকে বলিলেন, "রাম কোথায় আছেন? এখন পিতার অভাবে যিনি আমার পিতা, যিনি আমার বন্ধু, আমি যাঁহার দাস, সেই রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল

হইতেছে।" রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা নির্বাসিত হইয়াছেন শুনিয়া ভরত ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। . .

. . শেষে ভরতের উন্নতি ও রাজশ্রী -কামনায় কৈকেয়ী যে সকল কাণ্ড করিয়াছেন, তাহা বলিয়া পুত্রের প্রীতি উৎপাদনের প্রতীক্ষায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন।

নিবিড় মেঘমণ্ডল যেন আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ধর্মপ্রাণ বিশ্বস্ত ভ্রাতা এই দুঃসহ সংবাদের মর্ম ক্ষণকাল গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি মাতাকে যে ভর্ৎসনা করিলেন, তাহা তাঁহার মহাদুর্গতি স্মরণ করিয়া আমরা সম্পূর্ণরূপে সময়োপযোগী মনে করি— "তুমি ধার্মিকবর অশ্বপতির কন্যা নহ, তাঁহার বংশে রাক্ষসী। তুমি আমার ধর্মবৎসল পিতাকে বিনাশ করিয়াছ, ভ্রাতাদিগকে পথের ভিখারী করিয়াছ, তুমি নরকে গমন কর।" যখন কাতরকণ্ঠে ভরত এই সকল কথা বলিতে-ছিলেন, তখন অপর গৃহ হইতে কৌশল্যা সুমিত্রাকে বলিলেন, "ভরতের কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে, সে আসিয়াছে, তাহাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন।" কৃশাঙ্গী সুমিত্রা ভরতকে ডাকিয়া আনিলে কৌশল্যা বলিলেন, "তোমার মাতা তোমাকে লইয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করুন— তুমি আমাকে রামের নিকট পাঠাইয়া দাও।" এই কটূক্তিতে মর্মবিদ্ধ ভরত কৌশল্যার নিকট অনেক শপথ করিলেন। তিনি এই ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জানিতেন না— বহুপ্রকারে এই কথা জানাইতে চেষ্টা করিয়া নিদারুণ শোক ও লজ্জায় অভিভূত ভরত নিজের প্রতি অজস্র অভিসম্পাতবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে শোকে মুহ্যমান হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। করুণাময়ী অম্বা কৌশল্যা ধর্মভীরু কুমারের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন— তাঁহাকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ভরতের শোক এবং ঔদাসীন্য ক্রমেই যেন বাড়িয়া চলিল। শ্মশান-ঘাটে মৃত পিতার কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "পিতঃ, আপনি প্রিয় পুত্রদ্বয়কে বনে পাঠাইয়া নিজে কোথায় যাইতেছেন?"

অশ্রুপূর্ণকাতরদৃষ্টি রাজকুমারকে বশিষ্ঠ তাড়না করিতে করিতে পিতার ঔর্ধ্বদৈহিক কার্য-সম্পাদনে প্রবৃত্ত করাইলেন, শোকবিহ্বলতায় ভরত নিজে একেবারে চেষ্টাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন।

প্রাতে বন্দিগণ ভরতের স্তবগান আরম্ভ করিল, ভরত পাগলের ন্যায় ছুটিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন— "ইক্ষ্বাকুবংশের প্রথানুসারে সিংহাসন জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের প্রাপ্য, তোমরা কাহার বন্দনাগীতি গাহিতেছ?" রাজমৃত্যুর চতুর্দশ দিবসে বশিষ্ঠপ্রমুখ সচিববৃন্দ ভরতকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ভরত বলিলেন, "রামচন্দ্র রাজা হইবেন, অযোধ্যার সমস্ত প্রজামণ্ডলী লইয়া আমি তাঁহার পা ধরিয়া সাধিয়া আনিব, নতুবা চতুর্দশ বৎসরের জন্য আমিও বনবাসী হইব।"

শত্রুঘ্ন মন্থরাকে মারিতে গেল এবং কৈকেয়ীকে তর্জন করিয়া অনুসরণ করিলে, ক্ষমার অবতার ভরত তাহাকে নিষেধ করিলেন।

সমস্ত অযোধ্যাবাসী রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিতে ছুটিল। শৃঙ্গবের-পুরীতে গুহকের সঙ্গে ভরতের সাক্ষাৎকার হইল। ভরতকে গুহক প্রথমে সন্দেহ করিয়াছিল, কিন্তু ভরতের মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ইঙ্গুদীমূলে তৃণশয্যায় রাম একটু জলপান করিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। সেই তৃণশয্যা রামের বিশালবাহু-পীড়নে নিষ্পেষিত হইয়াছিল, সীতার উত্তরীয়-প্রক্ষিপ্ত স্বর্ণবিন্দু তৃণের উপর দৃষ্ট হইতেছিল, এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ভরত মৌনী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; গুহক কথা বলিতেছেন, ভরত শুনিতে পান নাই। ভরতকে সংজ্ঞাশূন্য দেখিয়া শত্রুঘ্ন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে

লাগিলেন— রানীগণ এবং সচিববৃন্দের শোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বহুযত্নে ভরত জ্ঞান লাভ করিয়া সাশ্রুনেত্রে বলিলেন, "এই নাকি তাঁহার শয্যা— যিনি আকাশস্পর্শী রাজপ্রাসাদে চিরদিন বাস করিতে অভ্যস্ত— যাঁহার গৃহ পুষ্পমাল্য, চিত্র ও চন্দনে চিরানুরঞ্জিত— যে গৃহশিখর নৃত্যশীল শুক ও ময়ূরের বিহারভূমি ও গীতবাদিত্রশব্দে নিত্যমুখরিত ও যাহার কাঞ্চনভিত্তিসমূহ কারুকার্যের আদর্শ— সেই গৃহপতি ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া ইঙ্গুদীমূলে পড়িয়া ছিলেন, এ কথা স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়, ইহা অবিশ্বাস্য। আমি কোন্ মুখে রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিব? ভোগ-বিলাসের দ্রব্যে আমার কাজ নাই, আমি আজ হইতে জটাবল্কল পরিয়া ভূতলে শয়ন করিব ও ফলমূলাহার করিয়া জীবনযাপন করিব।"

এবার জটাবল্কলপরিহিত শোকবিমূঢ় রাজকুমার ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে যাইয়া রামচন্দ্রের অনুসন্ধান করিলেন।— এই সর্বজ্ঞ ঋষিও প্রথমতঃ সন্দেহ করিয়া ভরতের মনঃপীড়া দিয়াছিলেন। একরাত্রি ভরদ্বাজের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া মুনির নির্দেশানুসারে রাজকুমার চিত্র-কূটাভিমুখে রওনা হইলেন। ভরদ্বাজ ভরতের শিবিরে আগমন করিয়া রানীদিগকে চিনিতে চাহিলেন। ভরত এইভাবে মাতাদিগের পরিচয় দিলেন, "ভগবন্, ঐ যে শোক এবং অনশনে ক্ষীণদেহা দেবতার ন্যায় সৌম্যমূর্তি দেখিতেছেন, ইনিই আমার অগ্রজ রামচন্দ্রের মাতা; উঁহার বামবাহু আশ্রয় করিয়া বিমনা অবস্থায় যিনি দাঁড়াইয়া আছেন, বনান্তরে শুষ্কপুষ্প কর্ণিকার-তরুর ন্যায় শীর্ণাঙ্গী— ইনি লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জননী সুমিত্রা; আর তাঁহার পার্শ্বে যিনি, তিনি অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীকে বিদায় করিয়া আসিয়াছেন, তিনি পতিঘাতিনী ও সমস্ত অনর্থের মূল, বৃথাপ্রজ্ঞামানিনী ও রাজ্যকামুকা— এই দুর্ভাগার মাতা।" বলিতে

বলিতে ভরতের দুইটি চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল এবং ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় একবার জলভরা চক্ষে মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

চিত্রকূটের সন্নিহিত হইয়া ভরত জননীবৃন্দ ও সচিবসমূহে পরিবৃত হইয়া রথ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অনশনক্লশ ও শোকের জীবন্ত-মূর্তি দেবোপম ভরত রামকে তৃণের উপর উপবিষ্ট দেখিয়া বালকের ন্যায় উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন— "হেমচ্ছত্র যাঁহার মস্তকের উপর শোভা পাইত, সেই রাজশ্রী-উজ্জ্বল শিরোদেশে আজ জটাভার কেন? আমার অগ্রজের দেহ চন্দন ও অগুরু দ্বারা মার্জিত হইত, আজ সেই অঙ্গরাগবিরহিত কান্তি ধূলিধূসর! যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রকৃতিপুঞ্জের আরাধনার বস্তু, তিনি বনে বনে ভিখারীর বেশে বেড়াইতেছেন— আমার জন্যই তুমি এই সকল কষ্ট বহন করিতেছ, এই লোকগর্হিত নৃশংস জীবনে ধিক্!" বলিতে বলিতে উচ্চস্বরে কাঁদিয়া ভরত রামচন্দ্রের পাদমূলে নিপতিত হইলেন। এই দুই ত্যাগী মহাপুরুষের মিলন-দৃশ্য বড় করুণ। ভরতের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, তাঁহারও মাথায় জটাজূট, দেহে চীরবাস। তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্রজের পাদমূলে লুণ্ঠিত। রামচন্দ্র বিবর্ণ ও কৃশ ভরতকে কষ্টে চিনিতে পারিলেন, অতি আদরে হাত ধরিয়া উঠাইয়া মস্তকাঘ্রাণপূর্বক অঙ্কে টানিয়া লইলেন; বলিলেন, "বৎস, তোমার এ বেশ কেন? তোমার এ বেশে বনে আসা যোগ্য নহে।"

ভরত জ্যেষ্ঠের পাদতলে লুটাইয়া বলিলেন, "আমার জননী মহাঘোর নরকে পতিত হইতেছেন, আপনি তাঁহাকে রক্ষা করুন; আমি আপনার ভাই, আপনার শিষ্য, দাসানুদাস, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনি রাজ্যে আসিয়া অভিষিক্ত হউন।" বহু কথা, বহু বিতণ্ডা চলিল; ভরত বলিলেন, "আমি চতুর্দশবৎসর বনবাসী হইব, এ প্রতিশ্রুতিপালন

আমার কর্তব্য।" কোনরূপে রামকে আনিতে না পারিয়া ভরত অনশনব্রত ধারণ করিয়া কুটীরদ্বারে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। রামচন্দ্র এই অবস্থায় সাদরে উঠাইয়া নিজের পাদুকা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। জটাভারশোভান্বিত করিয়া ভ্রাতৃপদরজে বিভূষিত পাদুকা তাঁহার মুকুটের স্থানীয় হইল। সহস্র ভূষণে যে শোভা দিতে অসমর্থ, এই পাদুকা সেই অপূর্ব রাজশ্রী ভরতকে প্রদান করিল। ভরত বিদায়-কালে বলিলেন, "রাজ্যভার এই পাদুকায় নিবেদন করিয়া চতুর্দশ বৎসর তোমার প্রতীক্ষায় থাকিব, সেই সময়ান্তে তুমি না আসিলে অগ্নিতে জীবন বিসর্জন করিব।" অযোধ্যার সন্নিকটবর্তী হইয়া ভরত বলিলেন, "অযোধ্যা আর অযোধ্যা নাই, আমি এই সিংহহীন গুহায় প্রবেশ করিতে পারিব না।" নন্দীগ্রামে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল, উহা রাজধানী নহে— ঋষির আশ্রম। সচিববৃন্দ জটাবল্কলপরিহিত ফলমূলাহারী রাজার পার্শ্বে কি বলিয়া মহার্ঘ পরিচ্ছদ পরিয়া বসিবেন, তাঁহারা সকলে কাষায়বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিলেন। সেই কাষায়বস্ত্র-পরিহিত সচিববৃন্দ -পরিবৃত, ব্রত-অনশনে কৃশাঙ্গ, ত্যাগী রাজকুমার পাদুকার উপর ছত্র ধরিয়া চতুর্দশ বৎসর রাজ্যপালন করিয়াছিলেন।· ·

রামচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগত হইলে ভরত স্বয়ং তাঁহার পদে সেই পাদুকা-দ্বয় পরাইয়া কৃতার্থ হইলেন এবং রামের পদে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "দেব, তুমি এই অযোগ্য করে যে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়াছিলে, তাহা গ্রহণ কর।" চতুর্দশ বৎসরে রাজকোষে সঞ্চিত অর্থ দশগুণ বেশী হইয়াছে।

রামায়ণে যদি কোন চরিত্র ঠিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে তাহা একমাত্র ভরতের চরিত্র। সীতা লক্ষ্মণকে যে কটূক্তি করিয়া-ছিলেন, তাহা ক্ষমার্হ নহে। রামচন্দ্রের বালিবধ ইত্যাদি অনেক কার্য

সমর্থন করা যায় না। লক্ষ্মণের কথা অনেক সময়ে অতি রুক্ষ ও দুর্বিনীত হইয়াছে। কৌশল্যা দশরথকে বলিয়াছিলেন, "কোন কোন জলজন্তু যেরূপ স্বীয় সন্তানকে ভক্ষণ করে, তুমিও সেইরূপ করিয়াছ।" কিন্তু ভরতের চরিত্রে কোন খুঁত নাই। পাদুকার উপর হেমচ্ছত্রধর জটা-বল্কলধারী এই রাজর্ষির চিত্র রামায়ণে এক অদ্বিতীয় সৌন্দর্যপাত করিতেছে। দশরথ সত্যই বলিয়াছিলেন—

"রামাদপি হি তং মন্যে ধর্মতো বলবত্তরম্।"

কৈকেয়ীর সহস্র দোষ আমরা ক্ষমার্হ মনে করি, যখন মনে হয় তিনি এরূপ সুপুত্রের গর্ভধারিণী।

ভাগ্যবিচার

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উদয়পুর থেকে পাঁচ ক্রোশ হবে নাহরামুংরা। সেইখানে এক পাহাড়; তাকে বলে ব্যাঘ্রমেরু; তারই উপরে থাকেন চারণীমন্দিরের সিদ্ধিকরী যোগিনী। পাহাড়ের অন্ধকার গুহার মধ্যে দেবীর দেউল। রাজপুত্রেরা দুরন্ত গরমে ঘোড়া ছুটিয়ে যখন মন্দিরে উপস্থিত হলেন, তখন সন্ধ্যাপূজার জোগাড় করতে সিদ্ধিকরী বাইরে গেছেন; মন্দির খালি; তারই মধ্যে অন্ধকারে কালো পাথরের চারণীদেবীর ফটিকের তিনটে চোখ মাত্র দেখা যাচ্ছে আর গুহার সামনে মস্ত একটা পাথরের চাতালে সন্ধ্যাবেলার আলো পড়েছে—রক্ত যেন ঢেলে দিয়েছে! সিদ্ধিকরীকে মন্দিরে না দেখে সুরজমল বলে উঠলেন, "কেমন, বলেছিলেম তো কপাল ফোঁপরা! মন্দির খালি, এখন দেবীকে একটি করে প্রণাম

দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে চলো।” পৃথ্বীরাজ ঘাড় নেড়ে বললেন, “তা হবে না, এইখানে বসতে হবে, আরতির পরে হাত গুনিয়ে তবে ছুটি!” একদিকে একটা বাঘের ছাল পাতা ছিল, আর একদিকে সিদ্ধিকরীর খাটিয়া, তার উপরে ছেঁড়া কাঁথা। পৃথ্বীরাজ তাড়াতাড়ি গিয়ে খাটিয়াতে বসলেন, দেখাদেখি জয়মলও উঁচুতে খাটিয়ায় বসল। বাঁশের খাটিয়া একবার মচাৎ করে শব্দ করেই চুপ করলে। সঙ্গ গিয়ে বসলেন বাঘছালের উপরে মাটিতে, আর সুরজমল বসলেন একটা হাঁটু বাঘছালে রেখে একেবারে আগুনের মতো তপ্ত পাথরের মেঝেয়।

ভর-সন্ধ্যেয় গুহার মধ্যে অন্ধকার বেশ একটু ঘনিয়ে এসেছে, সেই সময় প্রদীপ-হাতে সিদ্ধিকরী গুহাতে ঢুকেই দেখেন, চার মূর্তি। সঙ্গ উঠে সিদ্ধিকরীকে নমস্কার করে বসলেন। সুরজমলকে আর উঠতে হল না— তিনি যে মাটিতে বসেছিলেন সেই মাটিতেই সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করলেন। পৃথ্বীরাজ খাটিয়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘাড়টা নোয়ালেন, হাতদুটো একটু কপালের দিকে উঠেই আবার নেমে গেল; আর জয়মলটা উঠলও না, নমস্কারও দিলে না, বসে বসেই বললে, “মাতাজি, গণনা করে বলুন তো আমাদের মধ্যে কার কপালে চিতোরের সিংহাসনটা রয়েছে?” সিদ্ধিকরী কোন উত্তর না দিয়ে কেবল নিজের কপালেই হাত বোলাতে লাগলেন, আর গেরুয়াকাপড়ের খুঁটে মুখ মুছতে থাকলেন, দেখে পৃথ্বীরাজ বলে উঠলেন, “ভাবেন কি? বড় জরুরী কথা। বেশ করে ভেবেচিন্তে গণনা করে উত্তর দেবেন।” সঙ্গ বললেন, “আগে চারণীর পূজোটা ওঁকে সেরে নিতে দাও, পরে ও-সব কোয়ো।” “সেই ভালো”, বলে সিদ্ধিকরী পূজোয় বসলেন; চারণীর সামনে একবার পিদিম নেড়ে ঘণ্টাটা বাজিয়ে গোটাকতক প্রসাদী গাঁদা-ফুল চার পুত্রের মাথার পাগড়িতে গুঁজে দিয়ে বললেন, “রাজকুমারেরা,

একটা ইতিহাস বলি শোনো: পূর্বকালে উজ্জয়িনীনগরে একদিন মহারাজা বিক্রমাদিত্য রাজসভা ছেড়ে অন্দরে গিয়ে জলযোগ করতে বসবেন এমন সময় লক্ষ্মী-সরস্বতী বিবাদ করতে করতে সেখানে উপস্থিত। মহারাজা তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠে বললেন, 'দেবী, আপনাদের কি প্রয়োজনে আগমন, দাসকে বলুন।' দুইজনেই রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'বৎস বিক্রমাদিত্য, তুমি তো রাজা, বিচার করো দেখি, আমাদের দুজনের মধ্যে কে বড়।' বীণা-হস্তে সরস্বতী ঝংকার দিয়ে বললেন, 'আমি বড়, না ও বড়?' লক্ষ্মী বীণাপাণির ঝংকারের উপর অলংকার দিয়ে বললেন, 'এই আমি, না ওই ওটা, কে বড়?' রাজা দেখেন বড় গোলযোগ— একে বড় করলে উনি চটেন, ওঁকে খাটো করলে তিনি চটেন! রাজা দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোচ্ছেন দেখে বিক্রমাদিত্যের ছোটরানী বলে উঠলেন, 'ঠাকরুনরা, রাজাকে কিছু খেয়ে নিতে দিন, সারাদিন বিচার করে ওঁর এখন মাথার ঠিক নেই, সুবিচার করেন কেমন করে? আজকের রাতটা ওঁকে ভেবে ঠিক করতে দিন, কাল রাজসভায় ঠিক বিচার হয়ে যাবে দেখবেন।' রাজা বললেন, 'এ পরামর্শ মন্দ নয়, কঠিন সমস্যা, একটু সময় পেলে ভালো হয়।' দেবীরা 'তথাস্তু' বলে বিদায় হলেন। রাজা জলযোগে বসে ছোটরানীকে বললেন, 'দেবীদের আজকের মত তো বিদায় করলে, কিন্তু কালকের বিচারটা কি হবে কিছু ঠাউরেছ কি?' রানী ভিরকুটি করে বললেন, 'বিচারের আমি কি জানি! তোমার সভায় নবরত্নের মধ্যে কেউ পণ্ডিত, কেউ কবি, কেউ মন্ত্রী, কেউ যন্ত্রী; তাঁদের শুধোও না।' রাজা মাথা চুলকে সভায় প্রস্থান করলেন। সভার মধ্যে নবরত্ন হাজির— ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচি। রাজার প্রশ্ন শুনে ন'জনেই মাথা চুলকোতে আরম্ভ করলেন;

রাত্রি দুই প্রহর বাজল, কিছুই মীমাংসা হল না, দুই দেবীর বিচার কি হিসেবে করা যায়? সরস্বতীকে বড় বললে চটেন লক্ষ্মী, রাজ্যপাট সব যায়, নবরত্নেরও মাসহারা বন্ধ হয়। আবার যদি বলা যায় সরস্বতী ছোট, লক্ষ্মীই বড়, তবে বিদ্যে পালায়, বুদ্ধি পালায়, কালিদাসের কবিতা লেখা বন্ধ, ধন্বন্তরির চরকসংহিতা, বরাহমিহিরের পাঁজি-পুঁথি, খনার বচন সবই মাটি! রাজাই বা কি বুদ্ধি নিয়ে রাজ্য চালান, হিসেব দেখেন, বিচার করেন? বিক্রমাদিত্য বিষম ভাবিত হয়ে অন্দরে এসে বিছানা নিলেন। রানী দেখেন রাজার নিদ্রা নেই, কেবলই এপাশ-ওপাশ করছেন; যেন শয্যাকণ্টকী হয়েছে। তার পর”— এমন সময় পৃথ্বীরাজ বলে উঠলেন, “ও গল্প তো আমরা জানি। দুই দেবীর একজন এসে বসেছিলেন স্বর্ণ-সিংহাসনে, অন্যে বসেছিলেন রুপোর খাটে; ছোটবড় বিচার আপনিই হয়েছিল। গল্প থাক্, এখন দেখুন দেখি বিচার করে আমাদের মধ্যে রাজা হবে কে?”

সিদ্ধিকরী একবার চার জনের দিকে চেয়ে বললেন, “রাজকুমার, তোমরা নিজেই নিজেদের বিচার শেষ করে বসে আছ। সঙ্গ— যিনি বসে আছেন বাঘছালে বীরাসনে, উনিই ঠিক রাজার উপযুক্ত জায়গায় রয়েছেন— রাজ্যেশ্বর। সুরজমল বসেছেন মাটিতে— সঙ্গের কাছেই মাটিতে, কাজেই দেখা যাচ্ছে জমিতে ওঁর দখল, সিংহাসনের কাছাকাছি উনি থাকেন— হয় মন্ত্রী, নয় সর্দার, নয় জমিদার। আর পৃথ্বীরাজ, জয়মল, তোমরা বসেছ— সন্ন্যাসিনী যে আমি, আমার আসনে ছেঁড়া কাঁথায়— কাজেই ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে রাজ্যের স্বপ্ন দেখা ছাড়া তোমাদের অদৃষ্টে আর কিছুই নেই।” এই কথা বলেই সিদ্ধিকরী গুহার অন্ধকারের মধ্যে চলে গেলেন; চার রাজকুমারের চোখ বাঘের মত কটমট করে এর ওর দিকে চাইতে থাকল। সব-প্রথম সুরজমল কথা বললেন—

"তা হলে?" "তা হলে সিংহাসন কার এইখানেই স্থির হয়ে যাক আজই!" বলেই পৃথ্বীরাজ তলোয়ার খুলে সঙ্গকে আক্রমণ করলেন। সঙ্গ ছুটে গুহার বাহিরে যাবেন, তলোয়ারের চোপ পড়ল তাঁর একটি চোখের উপরে। চারণীদেবীর সামনে ভায়ের হাতে ভায়ের রক্তপাত ঘটল। সঙ্গ প্রাণভয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একদিকে গেলেন সুরজমল; পৃথ্বীরাজ, জয়মল গেলেন আর একদিকে— এর পিছনে উনি, তাঁর পিছনে তিনি। অন্ধকার ঢেকে নিলে চারজনকেই।

চারণীমন্দির থেকে প্রায় এক-রাতের পথে রাঠোরসর্দার 'বিদা'র কেল্লার বুরুজের ধরনে কাঁচামাটির দেওয়াল-ঘেরা খামার-বাড়ী।·· রক্তমাখা রাজকুমার সঙ্গ "রক্ষা করো" বলে বিদার দরজায় এসে ধাক্কা দিলেন। তাঁর একটা চোখের উপরে তলোয়ারের চোট পড়েছে, শরীরও অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত। বিদা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে রাজপুত্রকে দেখেই বলে উঠলেন, "একি! এমন দশা আপনার কে করলে?" সঙ্গ দু-কথায় তাকে বুঝিয়ে দিলেন— প্রাণ সংশয়, পৃথ্বীরাজ আর সুরজমল দুইজনেই অজ্ঞান হয়ে রাস্তার মাঝে পড়েছেন, কিন্তু জয়মল এখনও পিছনে তাড়া করে আসছেন তাঁকে মারতে। বিদা সঙ্গকে তাঁর নিজের ঘোড়া দিয়ে বললেন, "রাজকুমার, ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম করুন, পরে নতুন ঘোড়ায় অন্য গ্রামে রওনা হবেন।" ওদিকে জয়মল আসছেন একটা ঝড়ের মত— মাঠের উপর দিয়ে। সঙ্গের ইচ্ছে তখনই তিনি পলায়ন করেন, কিন্তু রাজভক্ত বিদা কিছুতেই তাঁকে ছাড়তে চায় না কিছু না খাইয়ে-দাইয়ে। ওদিকে বিপদ ক্রমে এগিয়ে আসছে। সঙ্গ ইতস্ততঃ করছেন দেখে বিদা বললেন, "কোনো ভয় নেই, আপনি ভিতরে যান। নিশ্চিন্ত হয়ে একটু বিশ্রাম করে যতক্ষণ না আপনি খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন

ততক্ষণ জয়মলকে এই দরজার চৌকাঠ পার হতে হবে না, আমি তাঁকে ঠেকিয়ে রাখব।" তাই হল। সঙ্গের নতুন ঘোড়া সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুবমুখে অনেক দূরে ছোট একটি কালো ফোঁটার মত আস্তে আস্তে দূর মাঠের একেবারে শেষে বনের আড়ালে মিলিয়ে গেছে, সেই সময় তিন ঘণ্টা ধস্তাধস্তির পরে বিদাকে মেরে তবে জয়মল বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন সঙ্গ চলে গেছে, কিন্তু তাঁর অকর্মণ্য ক্ষতবিক্ষত ঘোড়াটা উঠোনের মাঝে তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে খানিক শুকনো ঘাস চিবোচ্ছে আরামে। জয়মল রাজভক্ত রাজপুতবীরের রক্তে রাঙা হাতখানা দিয়ে নিজের কপাল চাপড়ে হতাশ মনে প্রাণশূন্য বিদার দিকে খানিক চেয়ে রইলেন— তার পর ঘাড় নীচু করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

এদিকে সকাল হয়ে গেল, কোন্ এক অজানা গাঁয়ের কিষাণরা সকালে ক্ষেতে যেতে-যেতে পথের ধারে দেখলে রক্তমাখা দুই রাজপুত্র সুরজমল আর পৃথ্বীরাজ। সবাই মিলে ধরাধরি করে রাজপুত্রদের ডুলিতে তুলে গাঁয়ে নিয়ে রাখলে। এদিকে মহারানারও লোকজন— তারাও বেরিয়েছে সন্ধানে, ঘোড়া পালকি সব নিয়ে, রাজকুমারদের ফেরাতে; কিন্তু কেবল পৃথ্বীরাজ সুরজমল দু-জনকে তারা সন্ধান করে ফিরে পেলে, আর দু-জন যে কোথায় তার আর খবরই হল না! পৃথ্বীরাজ রানীদের যত্নে আস্তে-আস্তে সেরে উঠলেন, সুরজমলের চোট বেশী, অনেক তদবিরে তিনি সুস্থ হলেন। মহারানা চার কুমারের ব্যাপার শুনে একদিন পৃথ্বীরাজকে ডেকে বললেন, "এই যে ঘটনা ঘটেছে, এর জন্য তুমিই দায়ী। সঙ্গ একেবারে নির্দোষ। সে কোথায় আছে, কি নেই, কিছুই জানা যাচ্ছে না; বেঁচে থাকে তো তোমারই ভয়ে সে কোথায় লুকিয়ে আছে। মনে কোরো না তোমাকে আমি চিতোরে বেশ আরামে বসিয়ে রাখব, আর আমি চোখ বুজলেই আস্তে-আস্তে সিংহাসনে

তুমি উঠে বসবে। আজই তুমি ঘোড়া অস্ত্র যা তোমার ইচ্ছে হয় নিয়ে বিদায় হও। লড়তেই যদি চাও তো বড় ভায়ের সঙ্গে না লড়ে পার তো রাজ্যের শত্রুদের জব্দ করো গে, তবে বুঝব তুমি বীর— যাও।" ছেলের উপর এই হুকুম দিয়ে সুরজমলকে রানা ডেকে বললেন, "তুমি সঙ্গকে বাঁচাতে চেয়েছিলে সেই জন্যে তোমাকে বেশী শাস্তি দেব না, আজ থেকে তুমি আমার আত্মীয় সারংদেবের ওখানে গিয়ে থাকো, চিতোর-মুখো হোয়ো না।" সুরজমল তো নির্বাসনে যান। এখন পৃথ্বীরাজ বার হলেন চিতোর ছেড়ে দিগ্‌বিজয়ে। তিনি জানতেন মহারানার কাছে যদি কখনো ক্ষমা পান তো সে বীরত্ব দেখিয়ে, মেবারের শত্রুদের শাসন করে তবে। রানা রাগলেও, প্রজারা পৃথ্বীরাজকে সত্যি ভালোই বাসত, কাজেই তাঁকে একেবারে একলা পড়তে হল না। দু-একজন করে ক্রমে একটি ছোটখাট দল তাঁর সঙ্গে জুটল, যাদের কাজই হল এখানে-ওখানে লড়াই করে বেড়ানো।· ·

রাজস্থানের মীনারা জংলী, দুর্দান্ত জাত; লুটপাট করাই তাদের কাজ। এদেরই রাজা মীনারায় নাম নিয়ে সমস্ত গদাওয়ার শাসন করছে। মহারানাকেও সে তুচ্ছ করে; নদালা ব'লে একটা গ্রামে তার আড্ডা। পৃথ্বীরাজ তাঁর পাঁচটি সঙ্গী· ·নিয়ে এই দুর্দান্ত মীনাকে জব্দ করবার মতলব করলেন। আহেরিয়া-পরব রাজস্থানের একটা মস্ত আনন্দের দিন; সেইদিন চাকর মনিব সব এক হয়ে শিকার, বনভোজন— এমনি নানা আমোদে দিনরাত মত্ত থাকে। সেই আনন্দের দিনে মীনারায় বড়-বড় মীনাকে নিয়ে বনের মধ্যে যখন তাড়ি খেয়ে আনন্দ করছে, সেই সময় নিজের দলবল সমেত পৃথ্বীরাজ তাকে আক্রমণ ক'রে তাদের ঘরদুয়োর জ্বালিয়ে ছারখার ক'রে দিলেন। রাজা কাটা পড়ল। মীনারা যারা বাকী রইল, বনে-জঙ্গলে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করলে।· ·

এদিকে জয়মল, তিনি ঘুরতে-ঘুরতে বেদনোরে গিয়ে হাজির। সে সময়ে বেদনোরে টোডার রাজা রায় শুরতান সিং পাঠানদের উৎপাতে রাজ্যসম্পদ সব হারিয়ে নিজের একমাত্র কন্যা পরমাসুন্দরী তারাবাইকে নিয়ে মহারানার আশ্রয়ে বাস করছিলেন। তারাবাই যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী, গুণবতী, তেজস্বিনী। কত রাজপুত্র তাঁকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞা পাঠানদের হাত থেকে যে বাপের সিংহাসন উদ্ধার করবে, তাকেই বিয়ে করবেন। জয়মল বেদনোরে এসে এই খবর শুনলেন; একদিন তারাবাইকেও দেখলেন— ঘোড়ায় চ'ড়ে ধনুর্বাণ হাতে শিকারে চলেছেন— যেন দেবী দুর্গা! জয়মল টোডা-রাজ্য উদ্ধার ক'রে দেবেন ব'লে প্রতিজ্ঞা-পত্র লিখে শুরতানের কাছে ঘটক পাঠালেন। শুরতান সিং জয়মলকে খুব খাতির ক'রে নিজের বাড়ীতে স্থান দিলেন। কিন্তু দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস, জয়মল পাঠানদের সঙ্গে লড়তে যাবার নামও করেন না; উল্টে বরং হঠাৎ রাতারাতি শুরতানকে মেরে তারাবাইকে বন্দী ক'রে নিয়ে পালাবার মতলবে রইলেন। শেষে অন্ধকার রাতে একদিন জয়মল হাতিয়ার হাতে চুপি-চুপি শুরতানের অন্দরমহলের দিকে অগ্রসর হলেন— ভূতের মতো মুখে কালিঝুলি মেখে। বেশী দূর যেতে হল না, অন্দরের দরজাতেই ধরা প'ড়ে গেলেন। কিন্তু জয়মল দুর্দান্ত গুণ্ডা; তাঁকে ধ'রে রাখা প্রহরীদের সাধ্য হল না। তিনি তলোয়ার খুলে তারাবাইকে তাঁর শয়ন-ঘর থেকে একেবারে হাত ধ'রে টেনে বাইরে আনবার চেষ্টা করলেন। তারাবাই সামান্য মেয়ে তো ছিলেন না! এক ঝাপটায় জয়মলকে দশহাত দূরে ফেলে দিয়ে একেবারে বাঘিনীর মতো তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে, একটি ছুরির ঘায়ে তাঁর সব আস্পর্ধা শেষ ক'রে দিলেন। শুরতান সিং ছুটে এসে জয়মলের মাথাটা

সঙ্গে-সঙ্গে কাঁধ থেকে ভুঁয়ে নামিয়ে মিথ্যাবাদীর শাস্তি দিলেন রীতিমত। জয়মল মহারানার ছেলে; আর শূরতান রাজা হলেও এখন মহারানার আশ্রিত, কাজেই চিতোরে যখন এই খবর পৌছল, তখন সবাই ভাবলে এইবার শূরতান গেলেন! কিন্তু মহারানা সমস্ত ব্যাপার শুনে দূতদের বললেন, "জয়মল শুধু যে আশ্রিত রাজার অপমান করেছে তা নয়, সে মিথ্যাবাদী, সে চোর, নির্বোধ, গোঁয়ার। কোন্ বাপ তার নিজের কন্যার অপমান সইতে পারে? শূরতান তার উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছেন। এমন অপদার্থ ছেলে গেছে, ভালোই হয়েছে। আমার কোনো আক্ষেপ নেই। যাও, শূরতানকে বলো গিয়ে—আজ থেকে বেদনোর রাজ্য তাঁকে দিলেম।"

পৃথ্বীরাজ যখন শুনলেন ছোট ভায়ের কাণ্ড, তখন রাগে লজ্জায় তাঁর মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। তিনি সেইদিনই বেদনোরের দিকে রওনা হলেন। রাজপুত্র পৃথ্বীরাজ, রাজকুমারী তারাবাই—দুজনেই সমান সুন্দর। সমানে সমানে মিলল। তিনি দেখলেন ওঁকে, উনি দেখলেন এঁকে! ভালোবাসলেন দুজনেই দুজনকে; কিন্তু প্রতিজ্ঞা রয়েছে, সেটা না পূর্ণ করতে পারলে বিয়ে হবার উপায় নেই। পৃথ্বীরাজ নিজের তলোয়ার ছুঁয়ে শপথ করলেন টোডা রাজ্য তিনি উদ্ধার করবেনই, আর সেইদিনই তারাবাইকে সঙ্গে নিয়ে আজমীরের দিকে ছদ্মবেশে রওনা হলেন। সঙ্গে গেল পৃথ্বীরাজের সেই পাঁচ সঙ্গী আর অনেক পিছনে চললেন শূরতান অসংখ্য রাজপুত সেপাই নিয়ে। তখন আশ্বিন মাস, মহরমের দিন। টোডা শহরের মোগল-বাজারের প্রকাণ্ড চক—নিশেন আর ঘোড়া আর নানাবর্ণের কাগজের তাজিয়া, দুল্‌দুল্, পাঞ্জা, লাঠি-সড়কি, ঢাল-তলোয়ার আর লোকে-লোকে গিস্‌গিস্ করছে। স্বয়ং সুলতান জুম্মা মসজিদের ছাদে উঠে তামাশা দেখছেন, এমন সময়

মস্ত একটা তাজিয়া সঙ্গে হাসন-হোসন করতে-করতে একদল লোক ঠিক স্থলতান যেখানে রয়েছেন সেখানে গিয়ে থামল। স্থলতান ঝরকা থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে দেখলেন ছ'জন ফকির সেই তাজিয়ার সঙ্গে। আর বেশী কিছু স্থলতানকে দেখতে হল না; ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা তীর এসে স্থলতানের বুকের মাঝ থেকে প্রাণটি শুষে নিয়ে সোঁ করে বেরিয়ে গেল— আকাশের দিকে। টোডার স্থলতান উল্টে পড়লেন; সঙ্গে-সঙ্গে রাজপুত ফৌজ এসে শহরে হানা দিলে। রাজপুত যারা, তারা গিয়ে পৃথ্বীরাজ আর তারাবাইকে ঘিরে লড়তে লাগল— মুসলমানদের সঙ্গে।· · সকাল বেলা পৃথ্বীরাজ টোডা দখল করে নিলেন।

পৃথ্বীরাজ আর তারাবাইয়ের বীরত্বের কথা মহারানার কাছে পৌঁছল। এইবার বাপের প্রাণ গলল। জয়মল নেই, সঙ্গ কোথায় তা কেউ জানে না, একমাত্র রয়েছেন পৃথ্বীরাজ— ছেলের মত ছেলে! মহারানা পৃথ্বীরাজের সঙ্গে তারাবাইয়ের বিয়ে দিয়ে কমলমীরের কেল্লায় দুজনকে থাকবার হুকুম দিলেন। · ·

এই ঘটনার কিছুদিন পরে রানার আত্মীয় সারংদেব আর সুরজমল দুজনে মিলে হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। পৃথ্বীরাজ তখন অনেক দূরে— কমলমীরে; সওয়ার খবর নিয়ে সেদিকে ছুটল— মহারানা দলবল নিয়ে চটপট লড়াইয়ে বেরিয়ে গেলেন। · · চিতোরের খুব কাছে গাভিরী নদীর ওপারে সুরজমল এসে দেখা দিলেন প্রকাণ্ড ফৌজ নিয়ে। সেইখানে ভীষণ যুদ্ধ বাধল। রানার ফৌজ ক্রমেই হঠতে লাগল। সন্ধ্যা প্রায় হয়, বাইশটা অস্তরের ঘা খেয়ে মহারানা দুর্বল হয়ে পড়েছেন, সুরজমলের সৈন্যরা নদীর এপারটাও দখল করেছে, বিদ্রোহীদের আর ঠেকিয়ে রাখা চলে না, এমন সময় এক হাজার রাজপুত নিয়ে পৃথ্বীরাজ এসে পড়লেন; যুদ্ধ সেদিনের মত স্থগিত রইল। দুই দলেই লড়াই

বন্ধ রেখে যে যার তাঁবুতে বিশ্রাম করছে, মাঠের দিকে দিকে মশাল আর ধুনি জ্বলছে; সারাদিনের পর সুরজমল অনেকগুলো অস্ত্রের চোট খেয়ে নাপিত ডেকে কাটা ঘা-গুলো ধুয়ে পুঁছে পটি বেঁধে একটু বিশ্রামের চেষ্টায় আছেন, এমন সময় হঠাৎ সামনে পৃথ্বীরাজকে দেখে সুরজমল খাটিয়া ছেড়ে এমন বেগে দাঁড়িয়ে উঠলেন যে, তাঁর বুকে বাঁধা কাপড়ের পটিটা ছিঁড়ে ঘা দিয়ে রক্ত ছুটল। পৃথ্বীরাজ তাড়াতাড়ি খুড়োকে ধ'রে খাটিয়াতে শুইয়ে দিয়ে বললেন, "ভয় নেই; কেমন আছ তাই জানতে এলেম।" সুরজমল একটু হেসে বললেন, "হঠাৎ তুমি এসে পড়ায় একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেম। যা হোক, অনেকদিন পরে তোমাকে দেখে খুশী হলেম। মহারানার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর নি?" পৃথ্বীরাজও হেসে বললেন, "কমলমীরে তোমার খবর পেয়েই ছুটে আসছি, বাবার সঙ্গে এখনো দেখা হয় নি।" এই সময় এক দাসী সোনার থালায় খাবার নিয়ে হাজির হল। সুরজমল বললেন, "আরে, দেখছিস নে কে এসেছে! যা দৌড়ে আর এক থাল নিয়ে আয়।" দাসী এদিক-ওদিক চাইছে দেখে সুরজমল বললেন, "বুঝেছি, সারংদেব এই একথালা বই আর কিছু পাঠায় নি।" "খুড়ো-ভাইপোতে আজ এক থালেই খাবে।"— বলেই পৃথ্বীরাজ একটা মিষ্টি তুলে মুখে দিলেন। দিনের বেলার শত্রুতা গল্প-হাসি খাওয়া-দাওয়ার চোটে কোথায় পালিয়ে গেল! বিদায়ের সময় পৃথ্বীরাজ খুড়োকে বললেন, "আমাদের পুরোনো ঝগড়াটা তা হলে আজ তোলা থাক, কাল সকালেই শেষ করা যাবে, কি বল?" সুরজমল হেসে বললেন, "বেশ, আজকের মত একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। কিন্তু কাল খুব সকালেই আমি তৈরি থাকব জেনো।"

তার পরদিনের লড়াইয়ে বিদ্রোহীদের পৃথ্বীরাজ হারিয়ে দিলেন। সুরজমল সারংদেবকে নিয়ে পালিয়ে চললেন। পৃথ্বীরাজও তাদের

পিছনে তাড়িয়ে চললেন— একটার পর একটা পরগনা বিদ্রোহীদের হাত থেকে আবার জয় করতে করতে। শেষে সুরজমলের একটু দাঁড়াবারও স্থান রইল না। সারংদেবের রাজ্যটা পর্যন্ত পৃথ্বীরাজ দখল করে নিলেন।· · সব রাজার রাজ্যের সীমানার বাইরে এই দেউলগড়ে সুরজমল নির্ভয়ে রইলেন, নিশ্চিন্ত হয়ে মরবার সময় পেলেন; তাঁর কপালের লিখন এমনি করে ফলল।

জয়মল, সুরজমল, দুজনেই চিতোরের সিংহাসন আর পৃথ্বীরাজের মাঝ থেকে সরে পড়লেন; রইলেন কেবল সঙ্গ। একদিন কমলমীরে পৃথ্বীরাজের চর এসে খবর দিলে— সঙ্গ বেঁচে আছেন; শ্রীনগরের রাজার মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ের উদ্‌যোগ হচ্ছে। পৃথ্বীরাজ তখনই নিজের দলবল নিয়ে সঙ্গকে জালে বাঁধার পরামর্শ করতে বসলেন; কিন্তু পৃথ্বীরাজের অদৃষ্টও বসে ছিল না, সে দিনে-রাতে আলোতে-অন্ধকারে সুখে-দুঃখে মিলিয়ে যে বেড়াজাল পৃথ্বীরাজকে ধরবার জন্যে বুনে চলেছিল, এতদিনে সেটা শেষ হল। সকালে পৃথ্বীরাজ সেজেগুজে বার হবেন, এমন সময় শিরোহি থেকে পৃথ্বীরাজের ছোটবোন এক পত্র পাঠালেন। সে অনেক দুঃখের কাহিনী। বিয়ে হয়ে অবধি তাঁর স্বামী তাঁকে অপমান করছে, লাথি মারছে, ঘরের বার করে দিতে চাইছে। সে নেশাখোর, দুষ্ট এবং একেবারে নির্দয়। বাবা বুড়ো হয়েছেন, এখন দাদা এসে এই অপমানের প্রতিশোধ না নিলে তাঁর ছোটবোন মারা যাবে। ছোট-বোনের কান্না-ভরা সেই চিঠি পড়ে, পৃথ্বীরাজ চলেছিলেন শ্রীনগরের বাইরের দিকে তলোয়ার উঁচিয়ে— কিন্তু যাওয়া হল না, পৃথ্বীরাজের ঘোড়া ফিরল শিরোহির মুখে— বোনকে রক্ষা করতে। অদৃষ্ট টেনে নিয়ে চলল পৃথ্বীরাজকে সঙ্গের দিক থেকে ঠিক উল্টো মুখে— অনেক দূরে!

রাতের অন্ধকারে শয়নঘরের মেঝেয় পড়ে রানার মেয়ে কেবলই চোখের জল ফেলছেন, রানার দেওয়া সোনার খাটে শিরোহির রাজা ভরপুর নেশায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, হঠাৎ সেই সময় পৃথ্বীরাজ ঘরে ঢুকে এক লাথিতে শিরোহির রাজাটাকে ভুঁয়ে ফেলে দাড়ি চেপে ধরলেন। রানার মেয়ে পৃথ্বীরাজের তলোয়ার চেপে ধরে বললেন, "দাদা থামো, প্রাণে মেরো না।" পৃথ্বীরাজ রেগে বললেন, "এত বড় ওর সাহস, তোর গায়ে হাত তোলে। জানে না, তুই মহারানার মেয়ে। ওকে কুকুরের মত চাবুক মেরে সিধে করতে হয়।" শিরোহির তখন নেশা ছুটে গেছে, সে পৃথ্বীরাজের পা জড়িয়ে বললে, "এমন কাজ আর হবে না, ক্ষমা করো।" পৃথ্বীরাজ তার ঘাড় ধরে দাঁড় করিয়ে বললেন, "নে, আমার বোনের জুতোজোড়া মাথায় করে ওর কাছে ক্ষমা চা— তবে রক্ষে পাবি।" "এ কথা আগে বললেই হত" বলে তাড়াতাড়ি জুতোজোড়া তুলে নেয় দেখে রানী বললেন, "থাক্, এবার এই পর্যন্ত। যাও, এখন দাদাকে জলটল খাইয়ে ঠাণ্ডা করো গে, আমায় একটু ঘুমতে দাও।" রানার জামাই খুব খাতির করে পৃথ্বীরাজকে বাইরে নিয়ে বসিয়ে সোনার রেকাবিতে শিরোহির খাসা নাড়ু গুটিকতক জল-খেতে দিলেন। শিরোহির খাসা নাড়ু— অমন নাড়ু আর কোথাও হয় না, পৃথ্বীরাজ তাই গোটা চার-পাঁচ মুখে ফেলে এক ঘটি জল খেয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে কমলমীরে আপনার দলবলের সঙ্গে মিলতে চললেন। কমলমীরে আর তাঁর পৌঁছতে হল না; শিরোহির মতিচুর সেঁকোবিষ আর হীরেচুরে মেখে তাঁর ভগিনীপতি খেতে দিয়েছিল— জুতো-তোলার শোধ নিতে।

তখন রাত কেটে সবে সকাল হচ্ছে, দূর থেকে কমলমীর অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেই সময় পৃথ্বীরাজ ঘোড়া থেকে ঘুরে পড়লেন— রাস্তার

ধুলোয়! কমলমীর— যেখানে তাঁর তারারানী একা রয়েছেন, সেই-দিকে চেয়ে তাঁর প্রাণ হঠাৎ বেরিয়ে গেল।· · আর ঠিক সেই সময় সঙ্গের অদৃষ্ট শ্রীনগরের নহবতখানায় বসে আশা-রাগিণীর সুর বাজিয়ে দিলে— ভোর ভয়ি, ভোর ভয়ি।

মহেশ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ্রামের নাম কাশীপুর। গ্রাম ছোট, জমিদার আরও ছোট, তবু, দাপটে তাঁর প্রজারা টুঁ শব্দটি করিতে পারে না— এমনই প্রতাপ।

ছোট ছেলের জন্মতিথি-পূজা। পূজা সারিয়া তর্করত্ন দ্বিপ্রহর-বেলায় বাটী ফিরিতেছিলেন। বৈশাখ শেষ হইয়া আসে, কিন্তু মেঘের ছায়াটুকু কোথাও নাই, অনাবৃষ্টির আকাশ হইতে যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে।

সম্মুখের দিগন্তজোড়া মাঠখানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে, আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধোঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। অগ্নিশিখার মত তাহাদের সর্পিল ঊর্ধ্ব গতির প্রতি চাহিয়া থাকিলে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে— যেন নেশা লাগে।

ইহারই সীমানায় পথের ধারে গফুর জোলার বাড়ী। তাহার মাটির প্রাচীর পড়িয়া গিয়া প্রাঙ্গণ আসিয়া পথে মিশিয়াছে; এবং অন্তঃপুরের লজ্জা-সম্ভ্রম পথিকের করুণায় আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

পথের ধারে একটা পিটালি গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া তর্করত্ন উচ্চ-কণ্ঠে ডাক দিলেন, "ওরে, ও গফ্‌রা, বলি, ঘরে আছিস?"

তাহার বছর-দশেকের মেয়ে দুয়ারে দাঁড়াইয়া সাড়া দিল, "কেন বাবাকে? বাবার যে জ্বর।"

"জ্বর! ডেকে দে হারামজাদাকে। পাষণ্ড! ম্লেচ্ছ!"

হাঁক-ডাকে গফুর মিঞা ঘর হইতে বাহির হইয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাঙা প্রাচীরের গা ঘেঁষিয়া একটা পুরাতন বাবলা গাছ—তাহার ডালে বাঁধা একটা ষাঁড়। তর্করত্ন দেখাইয়া কহিলেন, "ওটা হচ্ছে কি শুনি? এ হিঁদুর গাঁ, ব্রাহ্মণ জমিদার, সে খেয়াল আছে?" তাঁর মুখখানা রাগে ও রৌদ্রের ঝাঁজে রক্তবর্ণ, সুতরাং সে মুখ দিয়া তপ্ত খরবাক্যই বাহির হইবে, কিন্তু হেতুটা বুঝিতে না পারিয়া গফুর শুধু চাহিয়া রহিল।

তর্করত্ন বলিলেন, "সকালে যাবার সময় দেখে গেছি বাঁধা, দুপুরে ফেরবার পথে দেখছি তেমনি ঠায় বাঁধা। গোহত্যা হলে যে কর্তা তোকে জ্যান্ত কবর দেবে। সে যে-সে বামুন নয়।"

"কি করব বাবাঠাকুর, বড় লাচারে পড়ে গেছি। ক'দিন থেকে গায়ে জ্বর, দড়ি ধ'রে যে দুখুঁটো খাইয়ে আনব—তা মাথা ঘুরে পড়ে যাই।"

"তবে ছেড়ে দে না, আপনি চরাই করে আসুক।"

"কোথায় ছাড়ব বাবাঠাকুর, লোকের ধান এখনো সব ঝাড়া হয় নি—খামারে প'ড়ে; খড় এখনো গাদি দেওয়া হয় নি, মাঠের আলগুলো সব জ্বলে গেল—কোথাও এক মুঠো ঘাস নেই, কার ধানে মুখ দেবে, কার গাদা ফেড়ে খাবে—ক্যাম্‌নে ছাড়ি বাবাঠাকুর?"

তর্করত্ন একটু নরম হইয়া কহিলেন, "না ছাড়িস তো ঠাণ্ডায় কোথাও বেঁধে দিয়ে দু আঁটি বিচুলি ফেলে দে না, ততক্ষণ চিবোক। তোর মেয়ে ভাত রাঁধে নি? ফ্যানে-জলে দে না এক গামলা, খাক্।"

গফুর জবাব দিল না। নিরুপায়ের মত তর্করত্নের মুখের পানে চাহিয়া তাহার নিজের মুখ দিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

তর্করত্ন বলিলেন, "তাও নেই বুঝি? কি করলি খড়? ভাগে এবার যা পেলি সমস্ত বেচে পেটায় নমঃ? গোরুটার জন্যে এক আঁটি ফেলে রাখতে নেই? ব্যাটা কসাই।"

এই নিষ্ঠুর অভিযোগে গফুরের যেন বাক্‌রোধ হইয়া গেল। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে কহিল, "কাহন-খানেক খড় এবার ভাগে পেয়েছিলাম, কিন্তু গেল সনের বকেয়া ব'লে কর্ত্তামশায় সব ধ'রে রাখলেন। কেঁদে কেটে হাতে পায়ে প'ড়ে বললাম, বাবুমশাই, হাকিম তুমি, তোমার রাজত্বি ছেড়ে আর পালাব কোথায়, আমাকে পণ-দশেক বিচুলিও না হয় দাও। চালে খড় নেই— একখানি ঘর, বাপ-বেটীতে থাকি, তাও না হয় তালপাতার গোঁজাগাঁজা দিয়ে এ বর্ষাটা কাটিয়ে দেব, কিন্তু না খেতে পেয়ে আমার মহেশ ম'রে যাবে।"

তর্করত্ন হাসিয়া কহিলেন, "ইস্! সাধ ক'রে আবার নাম রাখা হয়েছে মহেশ! হেসে বাঁচি নে।"

কিন্তু এ বিদ্রূপ গফুরের কানে গেল না, সে বলিতে লাগিল— "কিন্তু হাকিমের দয়া হল না। মাস-দুয়ের খোরাকের মত ধান দুটি আমাদের দিলেন, কিন্তু বেবাক খড় সরকারে গাদা হয়ে গেল, ও আমার কুটোটি পেলে না।"— বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর তাহার অশ্রুভারে ভারী হইয়া উঠিল। কিন্তু তর্করত্নের তাহাতে করুণার উদয় হইল না; কহিলেন, "আচ্ছা মানুষ তো তুই— খেয়ে রেখেছিস, দিবি নে? জমিদার কি তোকে ঘর থেকে খাওয়াবে নাকি? তোরা তো রামরাজত্বে বাস করিস— ছোটলোক কিনা, তাই তাঁর নিন্দে করে মরিস।"

গফুর লজ্জিত হইয়া বলিল, "নিন্দে করব কেন বাবাঠাকুর, নিন্দে তাঁর আমরা করি নে। কিন্তু কোথা থেকে দিই বলো তো? বিঘে-চারেক জমি ভাগে করি, কিন্তু উপরি উপরি দু সন অজন্মা— মাঠের ধান মাঠে শুকিয়ে গেল— বাপ-বেটীতে দু বেলা দুটো পেট ভ'রে খেতে পর্যন্ত পাই নে। ঘরের পানে চেয়ে দেখো, বিষ্টি-বাদলে মেয়েটাকে নিয়ে কোণে ব'সে রাত কাটাই, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাঁই মেলে না। মহেশকে একটিবার তাকিয়ে দেখো, পাঁজরা গোনা যাচ্ছে— দাও না ঠাকুরমশাই, কাহন-দুই ধার, গোরুটাকে দু দিন পেট পুরে খেতে দিই।"— বলিতে বলিতেই সে ধপ্ করিয়া ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। তর্করত্ন তীরবৎ দু পা পিছাইয়া গিয়া কহিলেন, "আ মর্— ছুঁয়ে ফেলবি নাকি?"

"না বাবাঠাকুর, ছোঁব কেন, ছোঁব না। কিন্তু দাও এবার আমাকে কাহন-দুই খড়। তোমার চার-চারটে গাদা সেদিন দেখে এসেছি— এ ক'টি দিলে তুমি টেরও পাবে না। আমরা না খেয়ে মরি ক্ষেতি নেই, কিন্তু ও আমার অবোলা জীব— কথা বলতে পারে না, শুধু চেয়ে থাকে, আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।"

তর্করত্ন কহিলেন, "ধার নিবি, শুধবি কি ক'রে শুনি?"

গফুর আশান্বিত হইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "যেমন ক'রে পারি শুধব বাবাঠাকুর, তোমাকে ফাঁকি দেব না।"

তর্করত্ন মুখে এক প্রকার শব্দ করিয়া গফুরের ব্যাকুল কণ্ঠের অনুকরণ করিয়া কহিলেন, "ফাঁকি দেব না! যেমন করে পারি শুধব! রসিক নাগর! যা যা সর্, পথ ছাড়্। ঘরে যাই, বেলা হয়ে গেল।"— এই বলিয়া তিনি একটু মুচকিয়া হাসিয়া পা বাড়াইয়াই সহসা সভয়ে পিছাইয়া গিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, "আ মর্, শিঙ নেড়ে আসে যে, গুঁতোবে নাকি?"

গফুর উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরের হাতে ফলমূল ও ভিজা চালের পুঁটুলি ছিল, সেইটা দেখাইয়া কহিল, "গন্ধ পেয়েছে, এক মুঠো খেতে চায়—"

"খেতে চায়? তা বটে! যেমন চাষা তার তেমনি বলদ। খড় জোটে না, চাল-কলা খাওয়া চাই। নে নে, পথ থেকে সরিয়ে বাঁধ্। যে শিঙ, কোন্ দিন দেখছি কাকে খুন করবে।"— এই বলিয়া তর্করত্ন পাশ কাটাইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

গফুর সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া মহেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নিবিড় গভীর কালো চোখ দুটি বেদনা ও ক্ষুধায় ভরা। কহিল, "তোকে দিলে না এক মুঠো? ওদের অনেক আছে, তবু দেয় না। না দিক গে—" তাহার গলা বুজিয়া আসিল, তার পরে চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কাছে আসিয়া নীরবে ধীরে ধীরে তাহার গলায় মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে চুপি চুপি বলিতে লাগিল, "মহেশ, তুই আমার ছেলে, তুই আমাদের আট সন প্রিতিপালন ক'রে বুড়ো হয়েছিস, তোকে আমি পেট পুরে খেতে দিতে পারি নে—কিন্তু তুই তো জানিস তোকে আমি কত ভালোবাসি।"

মহেশ প্রত্যুত্তরে শুধু গলা বাড়াইয়া আরামে চোখ বুজিয়া রহিল। গফুর চোখের জল গোরুটার পিঠের উপর রগড়াইয়া মুছিয়া ফেলিয়া তেমনি অস্ফুটে কহিতে লাগিল, "জমিদার তোর মুখের খাবার কেড়ে নিলে, শ্মশান-ধারে গাঁয়ের যে গো-চরটুকু ছিল তাও পয়সার লোভে জমা-বিলি করে দিলে, এই দুর্বচ্ছরে তোকে কেমন ক'রে বাঁচিয়ে রাখি বল্? ছেড়ে দিলে তুই পরের গাদা ফেড়ে খাবি, মানুষের কলাগাছে মুখ দিবি—তোকে নিয়ে আমি কি করি! গায়ে আর তোর জোর নেই, দেশের কেউ

তোকে চায় না। লোকে বলে, তোকে গো-হাটায় বেচে ফেলতে"—কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করিয়াই আবার তাহার দুচোখ বাহিয়া টপ্ টপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া গফুর একবার এদিকে ওদিকে চাহিল, তার পরে ভাঙা ঘরের পিছন হইতে কতকটা পুরোনো বিবর্ণ খড় আনিয়া মহেশের মুখের কাছে রাখিয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "নে, শিগগির ক'রে একটু খেয়ে নে বাবা, দেরি হলে আবার—"

"বাবা ?"

"কেন মা ?"

"ভাত খাবে এসো—" বলিয়া আমিনা ঘর থেকে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "মহেশকে আবার চাল ফেড়ে খড় দিয়েছ বাবা ?"

ঠিক এই ভয়ই সে করিতেছিল, লজ্জিত হইয়া বলিল, "পুরোনো পচা খড় মা, আপনিই ঝরে যাচ্ছিল—"

"আমি যে ভেতর থেকে শুনতে পেলাম বাবা, তুমি টেনে বার করছ ?"

"না মা, ঠিক টেনে নয় বটে—"

"কিন্তু দেওয়ালটা যে প'ড়ে যাবে বাবা—"

গফুর চুপ করিয়া রহিল। একটিমাত্র ঘর ছাড়া যে আর সবই গেছে। এবং এমনধারা করিলে আগামী বর্ষায় ইহাও টিকিবে না, এ কথা তাহার নিজের চেয়ে আর কে বেশী জানে ? অথচ এ উপায়েই বা কটা দিন চলে !

মেয়ে কহিল, "হাত ধুয়ে ভাত খাবে এসো বাবা, আমি বেড়ে দিয়েছি।"

গফুর কহিল, "ফ্যানটুকু দে তো মা, একেবারে খাইয়ে দিয়ে যাই।"

"ফ্যান যে আজ নেই বাবা, হাঁড়িতেই ম'রে গেছে।"

নেই! গফুর নীরব হইয়া রহিল। দুঃখের দিনে এটুকুও যে নষ্ট করা যায় না এই দশ বছরের মেয়েটাও তাহা বুঝিয়াছে। হাত ধুইয়া সে ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। একটা পিতলের থালায় পিতার শাকান্ন সাজাইয়া দিয়া কন্যা নিজের জন্য একখানি মাটির সান্‌কিতে ভাত বাড়িয়া লইয়াছে। চাহিয়া চাহিয়া গফুর আস্তে আস্তে কহিল, "আমিনা, আমার গায়ে যে আবার শীত করে মা— জ্বর-গায়ে খাওয়া কি ভালো?"

আমিনা উদ্বিগ্নমুখে কহিল, "কিন্তু তখন যে বললে বড় ক্ষিদে পেয়েছে?"

"তখন? তখন হয়তো জ্বর ছিল না মা।"

"তা হলে তুলে রেখে দি, সাঁঝের বেলা খেয়ো?"

গফুর মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিন্তু ঠাণ্ডা ভাত খেলে যে অসুখ বাড়বে, আমিনা।"

আমিনা কহিল, "তবে?"

গফুর কত কি যেন চিন্তা করিয়া হঠাৎ এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলিল; কহিল, "এক কাজ কর্‌ না মা, মহেশকে না হয় ধ'রে দিয়ে আয়। তখন রাতের বেলা আমাকে এক মুঠো ফুটিয়ে দিতে পারবি নে আমিনা?" প্রত্যুত্তরে আমিনা মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তার পরে মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "পারব বাবা।"

গফুরের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। পিতা ও কন্যার মাঝখানে এই যে একটুখানি ছলনার অভিনয় হইয়া গেল, তাহা এই দুটি প্রাণী ছাড়া আরও একজন বোধ করি অন্তরীক্ষে থাকিয়া লক্ষ্য করিলেন।

২

পাঁচ-সাত দিন পরে একদিন পীড়িত গফুর চিন্তিত মুখে দাওয়ায় বসিয়া ছিল, তাহার মহেশ কাল হইতে এখন পর্যন্ত ঘরে ফিরে নাই। নিজে সে শক্তিহীন, তাই আমিনা সকাল হইতে সর্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। পড়ন্ত বেলায় সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "শুনেছ বাবা, মানিক ঘোষেরা মহেশকে আমাদের থানায় দিয়েছে।"

গফুর কহিল, "দূর পাগ্‌লী।"

"হাঁ বাবা, সত্যি! তাদের চাকর বললে, তোর বাপকে বল্‌ গে যা দরিয়াপুরের খোঁয়াড়ে খুঁজতে।"

"কি করেছিল সে?"

"তাদের বাগানে ঢুকে গাছপালা নষ্ট করেছে, বাবা।"

গফুর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মহেশের সম্বন্ধে সে মনে মনে বহু-প্রকারের দুর্ঘটনা কল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু এ আশঙ্কা ছিল না। সে যেমন নিরীহ, তেমনি গরিব, সুতরাং প্রতিবেশী কেহ তাহাকে এত বড় শাস্তি দিতে পারে এ ভয় তাহার হয় নাই। বিশেষতঃ মানিক ঘোষ। গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি তাহার এ অঞ্চলে বিখ্যাত।

মেয়ে কহিল, "বেলা যে পড়ে এল বাবা, মহেশকে আনতে যাবে না?

গফুর বলিল, "না।"

"কিন্তু তারা যে বললে তিন দিন হলেই পুলিশের লোক তাকে গো-হাটায় বেচে ফেলবে?"

গফুর কহিল, "ফেলুক গে।"

গো-হাটা বস্তুটা যে ঠিক কি, আমিনা তাহা জানিত না, কিন্তু মহেশের সম্পর্কে ইহার উল্লেখমাত্রেই তাহার পিতা যে কিরূপ বিচলিত

হইয়া উঠিত ইহা সে বহুবার লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু আজ সে আর কোন কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

রাত্রের অন্ধকারে লুকাইয়া গফুর বংশীর দোকানে আসিয়া কহিল, "খুড়ো, একটা টাকা দিতে হবে।" এই বলিয়া সে তাহার পিতলের থালাটি বসিবার মাচার নীচে রাখিয়া দিল। এই বস্তুটির ওজন ইত্যাদি বংশীর সুপরিচিত। বছর-দুয়ের মধ্যে সে বার-পাঁচেক ইহাকে বন্ধক রাখিয়া একটি করিয়া টাকা দিয়াছে। অতএব আজও আপত্তি করিল না।

পরদিন যথাস্থানে আবার মহেশকে দেখা গেল। সেই বাবলাতলা, সেই দড়ি, সেই খুঁটা, সেই তৃণহীন শূন্য আধার, সেই ক্ষুধাতুর কালো চোখের সজল উৎসুক দৃষ্টি। একজন বুড়াগোছের মুসলমান তাহাকে অত্যন্ত তীব্র চক্ষু দিয়া পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। অদূরে একধারে দুই হাঁটু জড়ো করিয়া গফুর মিঞা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, পরীক্ষা শেষ করিয়া বুড়া চাদরের খুঁট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার ভাঁজ খুলিয়া বার বার মসৃণ করিয়া লইয়া তাহার কাছে গিয়া কহিল, "আর ভাঙব না, এই পুরোপুরিই দিলাম— নাও।"

গফুর হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া তেমনি নিঃশব্দেই বসিয়া রহিল। যে দুইজন লোক সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা গোরুর দড়ি খুলিবার উদ্‌যোগ করিতেই কিন্তু সে অকস্মাৎ সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া উদ্ধতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "দড়িতে হাত দিয়ো না বলছি— খবরদার বলছি, ভালো হবে না।"

তাহারা চমকিয়া গেল। বুড়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, "কেন?"

গফুর তেমনি রাগিয়া জবাব দিল, "কেন আবার কি। আমার জিনিস আমি বেচব না— আমার খুশি।" এই বলিয়া সে নোটখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

তাহারা কহিল, "কাল পথে আসতে বায়না নিয়ে এলে যে?"

"এই নাও না তোমাদের বায়না ফিরিয়ে।" বলিয়া সে ট্যাঁক হইতে দুটা টাকা বাহির করিয়া ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল। একটা কলহ বাধিবার উপক্রম হয় দেখিয়া বুড়া হাসিয়া ধীরভাবে কহিল, "চাপ দিয়ে আর দু টাকা বেশী নেবে, এই তো? দাও হে, পানি খেতে ওর মেয়ের হাতে দুটো টাকা দাও। কেমন, এই না?"

"না।"

"কিন্তু এর বেশী কেউ একটা আধলা দেবে না তা জান?"

গফুর সজোরে মাথা নাড়িয়া কহিল, "না।"

বুড়া বিরক্ত হইল, কহিল, "না তো কি? চামড়াটাই যে দামে বিকোবে, নইলে মাল আর আছে কি?"

তোবা! তোবা! গফুরের মুখ দিয়া হঠাৎ একটা বিশ্রী কটু কথা বাহির হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই সে ছুটিয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া শাসাইতে লাগিল যে তাহারা যদি অবিলম্বে গ্রাম ছাড়িয়া না যায় তো জমিদারের লোক ডাকিয়া জুতা-পেটা করিয়া ছাড়িবে।

হাঙ্গামা দেখিয়া লোকগুলা চলিয়া গেল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই জমিদারের সদর হইতে তাহার ডাক পড়িল। গফুর বুঝিল, এ কথা কর্তার কানে গিয়াছে।

সদরে ভদ্র-অভদ্র অনেকগুলি ব্যক্তি বসিয়া ছিল, শিবুবাবু চোখ রাঙা করিয়া কহিলেন, "গফ্‌রা, তোকে যে আমি কি সাজা দেব ভেবে পাই নে। কোথায় বাস করে আছিস, জানিস?"

গফুর হাতজোড় করিয়া কহিল, "জানি। আমরা খেতে পাই নে, নইলে আজ আপনি যা জরিমানা করতে, আমি 'না' করতাম না।"

সকলেই বিস্মিত হইল। এই লোকটাকে জেদী এবং বদ-মেজাজী

বলিয়াই তাহারা জানিত। সে কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, "এমন কাজ আর কখনো করব না কর্তা।" এই বলিয়া সে নিজেই দুই হাত দিয়া নিজের দুই কান মলিল এবং প্রাঙ্গণের একদিক হইতে আর একদিক পর্যন্ত নাকখত দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শিবুবাবু সদয়কণ্ঠে কহিলেন, "আচ্ছা, যা যা, হয়েছে। আর কখনো এ সব মতি-বুদ্ধি করিস নে।"

বিবরণ শুনিয়া সকলেই কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন এবং এ মহাপাতক যে শুধু কর্তার পুণ্যপ্রভাবে ও শাসনভয়েই নিবারিত হইয়াছে সে বিষয়ে কাহারও সংশয়মাত্র রহিল না। তর্করত্ন উপস্থিত ছিলেন, তিনি গো-শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিলেন এবং যে জন্য এই ধর্মজ্ঞানহীন ম্লেচ্ছজাতিকে গ্রামের ত্রিসীমানায় বসবাস করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ তাহা প্রকাশ করিয়া সকলের জ্ঞাননেত্র বিকশিত করিয়া দিলেন।

গফুর একটা কথার জবাব দিল না, যথার্থ প্রাপ্য মনে করিয়া অপমান ও সকল তিরস্কার সবিনয়ে মাথা পাতিয়া লইয়া প্রসন্নচিত্তে ঘরে ফিরিয়া আসিল। প্রতিবেশীদের গৃহ হইতে ফ্যান চাহিয়া আনিয়া মহেশকে খাওয়াইল এবং তাহার গায়ে মাথায় ও শিঙে বারংবার হাত বুলাইয়া অস্ফুটে কত কথাই বলিতে লাগিল।

৩

জ্যৈষ্ঠ শেষ হইয়া আসিল। রুদ্রের যে মূর্তি একদিন শেষ বৈশাখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সে যে কত ভীষণ, কত বড় কঠোর হইয়া উঠিতে পারে তাহা আজিকার আকাশের প্রতি না চাহিলে উপলব্ধি করাই যায় না। কোথাও যেন করুণার আভাস পর্যন্ত নাই। কখনো

এ রূপের লেশমাত্র পরিবর্তন হইতে পারে, আবার কোন দিন এ আকাশ মেঘভারে স্নিগ্ধ সজল হইয়া দেখা দিতে পারে, আজ এ কথা ভাবিতেও যেন ভয় হয়। মনে হয়, সমস্ত প্রজ্বলিত নভঃস্থল ব্যাপিয়া যে অগ্নি অহরহঃ ঝরিতেছে, ইহার অন্ত নাই, সমাপ্তি নাই— সমস্ত নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া না গেলে এ আর থামিবে না।

এমনি দিনে দ্বিপ্রহর-বেলায় গফুর ঘরে ফিরিয়া আসিল। পরের দ্বারে জন-মজুর খাটা তাহার অভ্যাস নয় এবং মাত্র দিন চার-পাঁচ তাহার জ্বর থামিয়াছে, কিন্তু দেহ যেমন দুর্বল তেমনি শ্রান্ত। তবুও আজ সে কাজের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু এই প্রচণ্ড রৌদ্র কেবল তাহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, আর কোন ফল হয় নাই। ক্ষুধায়, পিপাসায় ও ক্লান্তিতে সে প্রায় অন্ধকার দেখিতেছিল; প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাক দিল, "আমিনা, ভাত হয়েছে রে ?"

মেয়ে ঘর হইতে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া নিরুত্তরে খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইল।

জবাব না পাইয়া গফুর চেঁচাইয়া কহিল, "হয়েছে ভাত ? কি বললি— হয় নি ? কেন শুনি ?"

"চাল নেই, বাবা।"

"চাল নেই ? সকালে আমাকে বলিস নি কেন ?"

"তোমাকে রাত্তিরে যে বলেছিলুম।"

গফুর মুখ ভ্যাঙাইয়া কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া কহিল, "রাত্তিরে যে বলেছিলুম! রাত্তিরে বললে কারু মনে থাকে ?" নিজের কর্কশ কণ্ঠে ক্রোধ তাহার দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। মুখ অধিকতর বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, "চাল থাকবে কি করে ? রোগা বাপ থাক আর না থাক, বুড়ো মেয়ে চারবার পাঁচবার করে ভাত গিলবি! এবার থেকে চাল

আমি কুলুপ বন্ধ করে বাইরে যাব। দে, এক ঘটি জল দে, তেষ্টায় বুক ফেটে গেল। বল্‌, তাও নেই।”

আমিনা তেমনি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া গফুর যখন বুঝিল গৃহে তৃষ্ণার জল পর্যন্ত নাই, তখন সে আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। দ্রুতপদে কাছে গিয়া ঠাস্‌ করিয়া সশব্দে তাহার গালে এক চড় কসাইয়া দিয়া কহিল, “মুখপোড়া হারামজাদা মেয়ে, সারাদিন তুই করিস কি? এত লোকে মরে, তুই মরিস নে!”

মেয়ে কথাটি কহিল না, মাটির শূন্য কলসীটি তুলিয়া লইয়া সেই রৌদ্রের মাঝেই চোখ মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। সে চোখের আড়াল হইতেই কিন্তু গফুরের বুকে শেল বিঁধিল। মা-মরা এই মেয়েটিকে সে যে কি করিয়া মানুষ করিয়াছে সে কেবল সেই জানে। তাহার মনে পড়িল তাহার এই স্নেহশীলা কর্মপরায়ণা শান্ত মেয়েটির কোন দোষ নাই ক্ষেতের সামান্য ধান কয়টি ফুরানো পর্যন্ত তাহাদের পেট ভরিয়া দুবেলা অন্ন জুটে না। কোন দিন একবেলা, কোন দিন বা তাহাও নয়। দিনে পাঁচ-ছয়বার ভাত খাওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি মিথ্যা এবং পিপাসার জল না থাকার হেতুও তাহার অবিদিত নয়। গ্রামে যে দুই-তিনটা পুষ্করিণী আছে তাহা একেবারে শুষ্ক। শিবচরণবাবুর খিড়কির পুকুরে যা একটু জল আছে তা সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ের মাঝখানে দু-একটা গর্ত খুঁড়িয়া যাহা কিছু জল সঞ্চিত হয় তাহাতে যেমন কাড়াকাড়ি তেমনি ভিড়। বিশেষতঃ মুসলমান বলিয়া এই ছোট মেয়েটা তো কাছেই ঘেঁষিতে পারে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দূরে দাঁড়াইয়া বহু অনুনয়-বিনয়ে কেহ দয়া করিয়া যদি তাহার পাত্রে ঢালিয়া দেয় সেইটুকুই সে ঘরে আনে। এ সমস্তই সে জানে। হয়তো আজ জল ছিল না, কিংবা কাড়াকাড়ির মাঝখানে কেহ

মেয়েকে তাহার কৃপা করিবার অবসর পায় নাই— এমনিই কিছু একটা হইয়া থাকিবে নিশ্চয় বুঝিয়া তাহার নিজের চোখেও জল ভরিয়া আসিল। এমনি সময়ে জমিদারের পিয়াদা যমদূতের ন্যায় আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল, চীৎকার করিয়া ডাকিল, "গফ্‌রা, ঘরে আছিস?"

গফুর তিক্তকণ্ঠে সাড়া দিয়া কহিল, "আছি। কেন?"

"বাবুমশায় ডাকছেন, আয়।"

গফুর কহিল, "আমার খাওয়া দাওয়া হয় নি, পরে যাব।"

এত বড় স্পর্ধা পিয়াদার সহ্য হইল না। সে কুৎসিত একটা সম্বোধন করিয়া কহিল, "বাবুর হুকুম জুতো মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে।"

গফুর দ্বিতীয়বার আত্মবিস্মৃত হইল, সেও একটা দুর্বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিল, "মহারানীর রাজত্বে কেউ কারও গোলাম নয়। খাজনা দিয়ে বাস করি, আমি যাব না।"

কিন্তু সংসারে অত ক্ষুদ্রের অত বড় দোহাই দেওয়া শুধু বিফল নয়, বিপদের কারণ। রক্ষা এই যে, অত ক্ষীণ কণ্ঠ অত বড় কানে গিয়া পৌছায় না— না হইলে তাঁহার মুখের অন্ন ও চোখের নিদ্রা দুই-ই ঘুচিয়া যাইত। তাহার পরে কি ঘটিল বিস্তারিত করিয়া বলার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে যখন সে জমিদারের সদর হইতে ফিরিয়া ঘরে গিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল তখন তাহার চোখমুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাহার এত বড় শাস্তির হেতু প্রধানত মহেশ। গফুর বাটী হইতে বাহির হইবার পরে সেও দড়ি ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং জমিদারের প্রাঙ্গণে ঢুকিয়া ফুলগাছ খাইয়াছে, ধান শুকাইতেছিল তাহা ফেলিয়া ছড়াইয়া নষ্ট করিয়াছে, পরিশেষে ধরিবার উপক্রম করায় বাবুর ছোট মেয়েকে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে।

এরূপ ঘটনা এই প্রথম নয়— ইতিপূর্বেও ঘটিয়াছে, শুধু গরিব বলিয়াই

তাহাকে মাপ করা হইয়াছে। পূর্বের মত এবারও সে আসিয়া হাতে-পায়ে পড়িলে হয়তো ক্ষমা করা হইত, কিন্তু সে যে কর দিয়া বাস করে বলিয়া কাহারও গোলাম নয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে— প্রজার মুখের এত বড় স্পর্ধা জমিদার হইয়া শিবচরণবাবু কোন মতেই সহ্য করিতে পারেন নাই। সেখানে সে প্রহার ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদ মাত্র করে নাই, সমস্ত মুখ বুজিয়া সহিয়াছে, ঘরে আসিয়াও সে তেমনি নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা তাহার মনে ছিল না, কিন্তু বুকের ভিতরটা যেন বাহিরের মধ্যাহ্ন-আকাশের মতই জ্বলিতে লাগিল।

এমন কতক্ষণ কাটিল তাহার হুঁশ ছিল না, কিন্তু প্রাঙ্গণ হইতে সহসা তাহার মেয়ের আর্তকণ্ঠ কানে যাইতেই সে সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ছুটিয়া বাহিরে আসিতে দেখিল, আমিনা মাটিতে পড়িয়া এবং তাহার বিক্ষিপ্ত ভাঙা ঘট হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। আর মহেশ মাটিতে মুখ দিয়া সেই জল মরুভূমির মত যেন শুষিয়া খাইতেছে। চোখের পলক পড়িল না, গফুর দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া গেল। মেরামত করিবার জন্য কাল সে তাহার লাঙলের মাথাটা খুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই দুই হাতে গ্রহণ করিয়া সে মহেশের অবনত মাথার উপরে সজোরে আঘাত করিল।

একটিবার মাত্র মহেশ মুখ তুলিবার চেষ্টা করিল, তাহার পরেই তাহার অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণ দেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। চোখের কোণ বহিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু ও কান বহিয়া ফোঁটা-কয়েক রক্ত গড়াইয়া পড়িল। বার-দুই সমস্ত শরীরটা তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তার পরে সম্মুখ ও পশ্চাতের পা দুটা তাহার যত দূর যায় প্রসারিত করিয়া দিয়া মহেশ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

আমিনা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "কি করলে বাবা, আমাদের মহেশ যে মরে গেল!"

গফুর নড়িল না, জবাব দিল না, শুধু নির্নিমেষচক্ষে আর এক জোড়া নিমেষহীন গভীর কালো চক্ষের পানে চাহিয়া পাথরের মত নিশ্চল হইয়া রহিল।

ঘণ্টা-দুয়ের মধ্যে সংবাদ পাইয়া গ্রামান্তের মুচির দল আসিয়া জুটিল, তাহারা বাঁশে বাঁধিয়া মহেশকে ভাগাড়ে লইয়া চলিল। তাহাদের হাতে ধারালো চক্‌চকে ছুরি দেখিয়া গফুর শিহরিয়া চক্ষু মুদিল, কিন্তু একটা কথাও কহিল না।

পাড়ার লোকে কহিল, "তর্করত্নের কাছে ব্যবস্থা নিতে জমিদার লোক পাঠিয়েছেন, প্রাচিত্তিরের খরচ জোগাতে এবার তোকে না ভিটে বেচতে হয়।"

গফুর এ সকল কথারও উত্তর দিল না, দুই হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া ঠায় বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে গফুর মেয়েকে তুলিয়া কহিল, "আমিনা, চল্ আমরা যাই—"

সে দাওয়ায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "কোথায় বাবা?"

গফুর কহিল, "ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে।"

মেয়ে আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল। ইতিপূর্বে অনেক দুঃখেও পিতা তাহার কলে কাজ করিতে রাজী হয় নাই— সেখানে ধর্ম থাকে না, মেয়েদের ইজ্জত আব্রু থাকে না, এ কথা সে বহু বার শুনিয়াছে।

গফুর কহিল, "দেরি করিস নে মা, চল্, অনেক পথ হাঁটতে হবে।"

আমিনা জল খাইবার ঘটি ও পিতার ভাত খাইবার পিতলের থালাটি সঙ্গে লইতেছিল, গফুর নিষেধ করিল— "ওসব থাক্ মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।"

অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। এ গ্রামে আত্মীয় কেহ তাহার ছিল না, কাহাকেও বলিবার কিছু নাই। আঙিনা পার হইয়া পথের ধারে সেই বাবলাতলায় আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সহসা হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, "আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে, তার চ'রে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখে নি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ কোরো না।"

পরিচয়পঞ্জী

অক্ষয়কুমার দত্ত

জন্ম ১৮২০, ১৫ই জুলাই ; মৃত্যু ১৮৮৬, ২৮শে মে। নিবাস— চুপী, বর্ধমান। কলিকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়া দারিদ্র্যের জন্য বিদ্যালয় ছাড়িয়া দেন, কিন্তু অদম্য জ্ঞানপিপাসা -হেতু পড়াশুনার চর্চা ছাড়েন নাই। ইউরোপীয় বিজ্ঞানে ও দর্শনে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলাসাহিত্যে বিজ্ঞান-দর্শন বিষয়ে সর্বপ্রথম সার্থক রচনা তাঁহারই। 'সংবাদ প্রভাকর' -সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহাকে গদ্যরচনায় উৎসাহিত করেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদকরূপে অক্ষয়কুমারকে নিযুক্ত করেন। দীর্ঘ বারো বৎসর কাল ইহার সম্পাদক থাকিয়া তিনি নানা ভাবে বাংলাসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করেন। তাঁহার রচিত 'চারুপাঠ' (তিন ভাগ) বিখ্যাত ; 'ভূগোল', 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', 'ধর্ম্মনীতি', 'পদার্থ বিদ্যা', 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়' প্রভৃতি সুপরিচিত গ্রন্থগুলি তাঁহারই রচিত। সংকলিত রচনাটি 'চারুপাঠ' প্রথম ভাগ (১৮৫৩) হইতে গৃহীত।

অক্ষয়কুমার বড়াল

জন্ম ১৮৬০ ; মৃত্যু ১৯১৯, ১৯শে জুন। নিবাস— চোরবাগান, কলিকাতা। হেয়ার স্কুলে শিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই, কিন্তু আজীবন লেখাপড়ায় অনুরাগ ছিল। পঠদ্দশায় কবি বিহারিলাল চক্রবর্তীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সেই কবিতারচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১২৮৯ সালের আষাঢ়-সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত

"পুনর্মিলনে" নামক কবিতাটি তাঁহার প্রথম মুদ্রিত রচনা। পরে সেকালের বিখ্যাত প্রায় সকল সাময়িক পত্রেই তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইতে থাকে, ইহার অনেকগুলি সংগৃহীত হইয়া 'প্রদীপ' (প্রথম সংস্করণ ১৮৮৪), 'কনকাঞ্জলি', 'ভুল', 'শঙ্খ', 'এষা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত হইয়াছে। "শ্রাবণে" কবিতাটি 'প্রদীপ' (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৯৩) হইতে সংকলিত।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ১৮৭১, ৭ই আগস্ট; মৃত্যু ১৯৫১, ৫ই ডিসেম্বর। নিবাস—জোড়াসাঁকো, কলিকাতা। অবনীন্দ্রনাথের পিতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহোদর। বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। ছবি আঁকিতে ও নানাবিধ হাতের কাজ করিতেই তাঁহার আগ্রহ ছিল। পরে সাহিত্যসেবা আরম্ভ করেন এবং আজীবন শিল্প ও সাহিত্যের চর্চা করিয়া গিয়াছেন। চিত্রশিল্পী হিসাবে তিনি পৃথিবীবিখ্যাত, কথাশিল্পী হিসাবেও তাঁহার কৃতিত্ব কম নয়। 'শকুন্তলা', 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী', 'ভূতপত্রীর দেশ', 'নালক', 'পথে-বিপথে', 'বুড়ো আংলা', 'আপন কথা' প্রভৃতি পুস্তক তাহার প্রমাণ। শিল্প-বিষয়েও তাঁহার কয়েকটি বিখ্যাত বই আছে, যথা, 'ভারতশিল্প', 'বাংলার ব্রত', 'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী', 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ', 'ভারতশিল্পে মূর্তি' প্রভৃতি। রচনাটি 'রাজকাহিনী'র (প্রথম খণ্ড ১৯০৯) "বাপ্পাদিত্য" কাহিনী হইতে সংকলিত।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

জন্ম ১৮২০, ২৬শে সেপ্টেম্বর; মৃত্যু ১৮৯১, ২৯শে জুলাই। নিবাস—বীরসিংহ, মেদিনীপুর। নয় বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতার সংস্কৃত

কলেজে ভর্তি হন ও পাঠ সমাপ্ত করিয়া "বিদ্যাসাগর" উপাধি লাভ করেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তারে ও সমাজসংস্কারে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। শিক্ষাবিষয়ে সংস্কৃতশিক্ষার সংস্কার, বাংলাশিক্ষার ভিত্তিস্থাপন এবং স্ত্রীশিক্ষার পত্তন ও প্রসার তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। মেট্রোপলিটন ইন্স্টিটিউশন (বর্তমান 'বিদ্যাসাগর কলেজ') তাঁহারই স্থাপিত। সমাজ-সংস্কারে, বিধবাবিবাহ-প্রবর্তনে ও বহুবিবাহ-নিবারণে তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের কথায় "বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।" তাঁহার 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রভৃতি পুস্তক বাংলা গদ্যসাহিত্যের গোড়াপত্তন করিয়াছে। বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ বিষয়ে তাঁহার রচনা সমাজে ও সাহিত্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সংকলিত রচনাটি 'শকুন্তলা' (১৮৫৪) হইতে গৃহীত।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১৮৭৭, ১৯শে নবেম্বর। নিবাস— শান্তিপুর, নদীয়া। তিনি বি.এ. পর্যন্ত পড়িয়া অকৃতকার্য হইয়া ছাত্রজীবন সমাপ্ত করেন এবং ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে চাকরি-জীবন আরম্ভ করেন। গোড়ায় বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা এবং পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসসমূহের পরিদর্শকরূপে কাজ করিয়া ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। এগারো বৎসর বয়সে পঞ্চকোটে পার্বত্য পরিবেশের মধ্যে তাঁহার কবি-

জীবনের উন্মেষ হয় এবং সে জীবন আজিও অব্যাহত আছে। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে দেশপ্রেমমূলক কবিতা-সংগ্রহ 'বঙ্গমঙ্গল' প্রকাশ করিয়া তিনি গ্রন্থকার হন। পরে 'প্রসাদী', 'ঝরাফুল', 'শান্তিজল', 'ধান-দূর্ব্বা', 'শতনরী', 'রবীন্দ্র-আরতি' ও 'গীতারঞ্জন' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "জগত্তারিণী-স্বর্ণপদক" দিয়া সম্মানিত করেন। "জীবন-ভিক্ষা" কবিতাটি তাঁহার 'ধান-দূর্ব্বা' (১৯২১) কাব্যগ্রন্থ হইতে সংকলিত।

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

জন্ম ১৮৯৯, ২৪শে মে। নিবাস— চুরুলিয়া, বর্ধমান। স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে বাঙালী পল্‌টনে যোগদান করিয়া মেসোপটেমিয়া যান এবং যুদ্ধশেষে হাবিলদার হইয়া ফিরিয়া আসেন। যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবেশে কাব্য স্ফূর্তিলাভ করে এবং তাঁহার অদম্য প্রাণশক্তির বলে কাব্যধারা বন্যার আকার ধারণ করে। 'মোস্‌লেম ভারত' পত্রিকায় সেগুলির প্রকাশে সাহিত্যক্ষেত্রে সাড়া পড়িয়া যায় এবং অত্যল্প কাল মধ্যে তিনি যশস্বী হইয়া উঠেন। তাঁহার রচনা, প্রধানত কবিতা, অফুরন্তভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে এবং পর পর পুস্তকাকারে বাহির হয়। প্রথম যৌবনে "বিদ্রোহী" কবিতা লিখিয়া তিনি "বিদ্রোহী কবি" নামেই পরিচিত হইয়া পড়েন। সংগীত-রচয়িতা হিসাবে তিনি প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন। গত কয়েক বৎসর কঠিন ব্যাধিতে তিনি জীবন্মৃত অবস্থায় আছেন। 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'দোলন-চাঁপা', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'ছায়ানট', 'সন্ধ্যা', 'নজরুল-গীতিকা', 'সর্ব্বহারা', 'সঞ্চিতা' — তাঁহার বহু বইয়ের মধ্যে মাত্র কয়েকটি। সংকলিত রচনাটি একটি বিখ্যাত গান, তাঁহার 'সর্ব্বহারা'য় (১৯২৬) প্রথম প্রকাশিত হয়।

কামিনী রায়

জন্ম ১৮৬৪, ১২ই অক্টোবর; মৃত্যু ১৯৩৩, ২৭শে সেপ্টেম্বর। নিবাস— বাসণ্ডা, বরিশাল। মাত্র আট বৎসর বয়স হইতেই তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার "সুখ" কবিতাটি এণ্ট্রান্স পাস করিবার পূর্বেই রচিত। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে বি.এ. পাস করিয়া বেথুন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হন। তখন হইতে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে স্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সহিত বিবাহ পর্যন্ত আট বৎসরের মধ্যেই তাঁহার কাব্যজীবন বিশেষ স্ফূর্তিলাভ করিয়াছিল। তাঁহার প্রসিদ্ধ কবিতাগ্রন্থগুলি এই কালের মধ্যে প্রকাশিত। 'আলো ও ছায়া', 'মাল্য ও নির্মাল্য', 'গুঞ্জন', 'অশোক-সংগীত', 'দীপ ও ধূপ', 'জীবনপথে'— বাংলা কাব্যসাহিত্যে তাঁহার উল্লেখযোগ্য দান। সংকলনটি 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯) হইতে গৃহীত।

কালিদাস রায়

জন্ম ১৮৮৯, ৯ই জুলাই। নিবাস— কড়ুই, বর্ধমান। ইনি বাল্য-কাল হইতেই কাব্যসাধনা করিতেছেন, অল্প বয়সেই কবিখ্যাতি লাভ করেন। বি.এ. পাস করিয়া প্রধানত শিক্ষকতা-কার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং বরাবর কাব্যচর্চা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার কাব্যে বৈষ্ণব-প্রভাব বিশেষ লক্ষিত হয়। ছাত্রাবস্থায় প্রকাশিত 'কুন্দ' তাঁহার প্রথম কবিতা-পুস্তক। 'কিসলয়', 'পর্ণপুট', 'বল্লরী', 'ব্রজবেণু', 'রসকদম্ব', 'ঋতু-মঙ্গল', 'লাজাঞ্জলি', 'ক্ষুদকুঁড়া', 'চিত্তচিতা' প্রভৃতি অনেক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। "ছাত্রধারা" কবিতাটি তাঁহার 'হৈমন্তী' (১৯৩৪) হইতে গৃহীত।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

জন্ম ১৮৮৩, ১লা (২রা ?) মার্চ। নিবাস— শ্রীখণ্ড, অধুনা কোগ্রাম, বর্ধমান। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বি.এ. পাস করিয়া "বঙ্কিমচন্দ্র-সুবর্ণপদক" প্রাপ্ত হন। কিশোর বয়স হইতেই তিনি কবি। কিন্তু তাঁহার নিজের কথায়— "প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের কবিতাই প্রথম আমার চক্ষে কবিতার রূপ প্রকাশ করিয়া দেয়।" তিনি বিশেষভাবে বৈষ্ণবভাবাপন্ন। ছাত্রজীবন সমাপ্ত করিয়া শিক্ষকজীবন অবলম্বন করেন। কিশোরকাল হইতে আজ পর্যন্ত অজস্র কবিতা লিখিয়াছেন এবং এখনও লেখার বিরাম নাই। প্রথম কবিতা-পুস্তক 'শতদল' ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরে 'বনতুলসী', 'উজানি', 'একতারা', 'বীথি', 'বনমল্লিকা', 'নূপুর', 'তূণীর', 'রজনীগন্ধা', 'অজয়' প্রভৃতি বহু কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার শেষ কাব্যগ্রন্থ 'স্বর্ণসন্ধ্যা' ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। "উদ্যানে" কবিতাটি তাঁহার 'রজনীগন্ধা' (১৯২১) হইতে সংকলিত।

জগদীশচন্দ্র বসু

জন্ম ১৮৫৮, ৩০শে নবেম্বর ; মৃত্যু ১৯৩৭, ২৩শে নবেম্বর। নিবাস— রাড়িখাল, ঢাকা বিক্রমপুর। স্বদেশের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কৃতিত্বের সহিত কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এস-সি. ডিগ্রি লাভ করেন এবং স্বদেশে ফিরিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পদার্থবিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া তিনি অনেক নূতন আবিষ্কারের গৌরব লাভ করেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরাও তাঁহাকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া স্বীকার করেন। কলিকাতার "বসু-বিজ্ঞান-মন্দির" তাঁহার অক্ষয় কীর্তি।

বিজ্ঞানবিষয়ে সাহিত্য-রচনাতেও তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাঁহার 'অব্যক্ত' (১৯২১) বইখানিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রচনাটি 'অব্যক্ত' হইতে গৃহীত।

দীনেশচন্দ্র সেন

জন্ম ১৮৬৬, ৩রা নবেম্বর; মৃত্যু ১৯৩৯, ২০শে নবেম্বর। নিবাস—সুয়াপুর, ঢাকা। অতি বাল্যকাল হইতেই দীনেশচন্দ্র সাহিত্যসাধনা আরম্ভ করেন এবং ছাত্রজীবনেই নানা ভাবে পুরস্কৃত হন। কুমিল্লার শম্ভুনাথ স্কুলে প্রধানশিক্ষকরূপে কাজ করিবার সময় তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেন এবং প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের নিদর্শন-সংগ্রহে বাংলাদেশের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া অনেক পুঁথি-আবিষ্কারে সক্ষম হন। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার প্রধান কীর্তি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বেই সাহিত্যশিল্পী হিসাবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। 'রামায়ণী কথা', 'সতী', 'বেহুলা', 'ফুল্লরা', 'জড়ভরত', 'বৃহৎ বঙ্গ', 'বাংলার পুরনারী' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহাকে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগে বহু বৎসর 'রামতনু লাহিড়ী' -অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দীনেশচন্দ্র বহু প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়া বাংলাসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের লৌকিক গীতিকাব্যগুলি তাঁহারই যত্নে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. লিট্. উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। সংকলনটি তাঁহার 'রামায়ণী কথা' (১৯০৪) হইতে গৃহীত।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

জন্ম ১৮৬৩, ১৯শে জুলাই; মৃত্যু ১৯১৩, ১৭ই মে। নিবাস—কৃষ্ণনগর, নদীয়া। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে এম.এ. পাস করিয়া স্টেট স্কলারশিপ লইয়া বিলাত যান এবং ফিরিয়া আসিয়া ডেপুটিগিরিতে বাহাল হন। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের নবেম্বর মাসে 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত "শ্মশান সঙ্গীত" তাঁহার প্রথম মুদ্রিত কবিতা। বিলাতে অবস্থানকালে ইংরেজীতে কবিতা লিখিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধানত কবি হইলেও নাট্যকাররূপেই তাঁহার সমধিক খ্যাতি। তাঁহার গান, বিশেষ করিয়া হাসির গান, বাংলাসাহিত্যের সম্পদ। 'আর্য্যগাথা', 'আষাঢ়ে', 'হাসির গান', 'মন্দ্র', 'আলেখ্য', 'ত্রিবেণী', 'গান' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তাঁহার রচিত। সংকলিত রচনাটি তাঁহার একটি বিখ্যাত গান, 'পাষাণী' (১৯০০) গীতিনাটিকায় প্রথম প্রকাশিত। পরে 'গান' গ্রন্থে (১৯১৫) সন্নিবিষ্ট হয়।

নবীনচন্দ্র সেন

জন্ম ১৮৪৭, ১০ই ফেব্রুয়ারি; মৃত্যু ১৯০৯, ২৩শে জানুয়ারি। নিবাস—নয়াপাড়া, চট্টগ্রাম। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে বি.এ. পাস করিয়া প্রথমে হেয়ার স্কুলের শিক্ষক এবং পরে ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। ৩৬ বৎসর এই কার্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় 'এডুকেশন গেজেট'এ তাঁহার "কোনো এক বিধবা কামিনীর প্রতি" কবিতাটি প্রকাশিত হয়। সারাজীবন তিনি সাহিত্যচর্চা করিয়াছেন। তিনি প্রধানত কবি হইলেও গদ্যরচনাতেও তাঁহার হাত ছিল, তাঁহার আত্মচরিত 'আমার জীবন'এ তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'অবকাশ-রঞ্জিনী', 'পলাশির যুদ্ধ', 'রঙ্গমতী', 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস',

'অমিতাভ', 'অমৃতাভ' সমধিক প্রসিদ্ধ। রচনাটি 'পলাশির যুদ্ধ' (১৮৭৫) হইতে সংকলিত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ১৮৩৮, ২৬শে জুন; মৃত্যু ১৮৯৪, ৮ই এপ্রিল। নিবাস—কাঁঠালপাড়া, চব্বিশ-পরগনা। তাঁহার ছাত্রজীবন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুই জন গ্রাজুয়েটের এক জন। পরীক্ষাপাসের সঙ্গে সঙ্গে ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট-রূপে সরকারী চাকরিতে বাহাল হন এবং আজীবন যোগ্যতার সহিত সেই কাজ করিয়া যান। হুগলী কলেজে ছাত্রাবস্থা হইতেই তাঁহার সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত; ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'এ তাঁহার বহু গদ্য পদ্য রচনা প্রকাশিত হয়। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার খ্যাতি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে ও তিনি পর পর অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়া সাহিত্যসম্রাট্‌রূপে সম্মানিত হন। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তৎসম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্র বাংলাসাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করে। সাহিত্যের বহু ব্যাপারে তিনি প্রথম পথপ্রদর্শক।

'দুর্গেশনন্দিনী'র পর 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ', 'আনন্দ মঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' প্রভৃতি একে একে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধসাহিত্যেও বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া 'বিজ্ঞানরহস্য', 'সাম্য', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'ধর্ম্মতত্ত্ব' প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশ করেন। তাঁহার রচনায় বিষয়বস্তু ও শিল্পকলার অপূর্ব সামঞ্জস্য দেখা যায়। ভাষায় সাধুরীতি ও চল্‌তি রীতির সমন্বয় সাধন করিয়া তিনি বাংলা গদ্যরচনার ভঙ্গীকে যথেষ্ট শক্তিশালী করিয়া তুলেন। এই

সংকলনে 'আনন্দ মঠ' (১৮৮২) ও 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্গত "বঙ্গদেশের কৃষক" (১৮৭২) হইতে নির্বাচিত অংশ দেওয়া হইয়াছে। "বন্দে মাতরম্" সংগীত 'আনন্দ মঠ' গ্রন্থেই প্রথম প্রকাশিত হয়।

বিবেকানন্দ স্বামী (নরেন্দ্রনাথ দত্ত)

জন্ম ১৮৬৩, ১২ই জানুয়ারি ; মৃত্যু ১৯০২, ৪ঠা জুলাই। নিবাস— সিমলা, কলিকাতা। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রধান শিষ্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহে ভারতীয় বেদান্তধর্মের প্রচারক হিসাবে তিনি পৃথিবীবিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার জীবনে ধর্ম, মানবসেবা ও স্বদেশপ্রেমের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তিনি অদ্বিতীয় বক্তা ছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর তিনি পদব্রজে সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন এবং ভারতবর্ষের অনশ্বর স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আমেরিকা যাত্রা করেন। শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় (১৮৯৩) বেদান্ত-বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া স্বামী বিবেকানন্দ অল্পকালেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের আত্মিক মিলন-সাধনে তাঁহার প্রচার বিশেষ কার্যকর হইয়াছিল। সিস্টার নিবেদিতা তাঁহারই দীক্ষায় ভারতবর্ষকে আপন করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ বক্তৃতা ও রচনা ইংরেজী ভাষায়। কয়েকটি গান, কবিতা ও পত্র -রচনা বাদ দিলে তিনি মাতৃভাষায় মাত্র চারিখানি গ্রন্থের রচয়িতা— 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত' ও 'পরিব্রাজক'। রচনাটি তাঁহার 'ভাববার কথা' (১৯০৭) হইতে সংকলিত।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

জন্ম ১৮২৭, ২২শে ফেব্রুয়ারি ; মৃত্যু ১৮৯৪, ১৫ই মে। নিবাস— চুঁচুড়া, হুগলী। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পরে তিনি বেসরকারী

স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করিয়া শেষে সরকারী শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন এবং ইন্সপেক্টর-অব-স্কুল্‌স্‌ রূপে কার্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দ হইতেই তিনি লেখকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলাভাষায় প্রবন্ধ রচনায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আদর্শ নিবন্ধ-লেখক হিসাবে তিনি সম্মানিত হইয়া থাকেন। বাংলা-দেশের নৈতিক ও সামাজিক জীবনকে উন্নত করিবার জন্য তিনি প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে অনেকগুলি গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'পুষ্পাঞ্জলি', 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থ বিখ্যাত। 'শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার' (মাসিক) ও 'এডুকেশন গেজেট' (সাপ্তাহিক) তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। প্রবন্ধটি 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২) হইতে সংকলিত।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

জন্ম ১৮২৪, ২৫শে জানুয়ারি; মৃত্যু ১৮৭৩, ২৯শে জুন। নিবাস—সাগরদাঁড়ী, যশোহর। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় খ্রীস্টধর্ম অবলম্বন করিয়া মাইকেল মধুসূদন নাম লইয়াছিলেন। জীবনের প্রথমার্ধ ইংরেজীতে কাব্য রচনা করিতেন। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজ-প্রবাস হইতে ফিরিয়া বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় (৩১শে জুলাই, ১৮৫৮) দেখিয়া তিনি মাতৃ-ভাষায় নাটক রচনার সংকল্প করেন। ফলে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটক' প্রকাশিত হয়। মধুসূদনের মত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত প্রতিভাশালী কবির হাতে বাংলাসাহিত্যের অনেক নূতনত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যরীতি-সংগত নাটক ও প্রহসন,

অমিত্রাক্ষর ছন্দ, চতুর্দশপদী কবিতা এবং বিশেষ এক গদ্যরীতির প্রবর্তক হিসাবে তিনি বাংলাদেশে অমর হইয়াছেন। তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ শুধু বাংলা কাব্যকে নয়, বাংলা গদ্যকেও শক্তিশালী করিয়াছে। তাঁহার 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য', 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' বাংলা কাব্যসাহিত্যকে অসাধারণ সমৃদ্ধি দান করিয়াছে। "আত্মবিলাপ" কবিতাটি ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের শেষ ভাগে রচিত ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত। "কাশীরাম দাস" কবিতাটি 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬) হইতে গৃহীত।

মীর মশাররফ হোসেন মরহুম্

জন্ম ১৮৪৭, ১৩ই নবেম্বর ; মৃত্যু ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের শেষে অথবা ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের গোড়ায়। নিবাস— লাহিনীপাড়া, নদীয়া। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি বাংলাসাহিত্যের লেখক। 'গ্রামবার্তা-প্রকাশিকা'র সম্পাদক বিখ্যাত হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ) তাঁহার সাহিত্যগুরু। মীর মশাররফ হোসেন মরহুম্ বাংলাদেশের উনবিংশ শতাব্দীর মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রণী এবং সর্বপ্রথম সাহিত্যশিল্পী। সংবাদ-পত্র-পরিচালনেও তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'বিষাদ-সিন্ধু' (১-৩ খণ্ড, ১৮৮৫-৯১) হইতে রচনাটি সংকলিত।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

জন্ম ১৮৭৮, ২৭শে নবেম্বর ; মৃত্যু ১৯৪৮, ১লা ফেব্রুয়ারি। নিবাস— যমসেরপুর, নদীয়া। রবীন্দ্রশিষ্যদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ, অতি অল্প বয়সেই কবিতা লিখিয়া ও 'ভারতী', 'সাহিত্য' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে প্রকাশ করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাণীর সাধনা

করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'রেখা', 'লেখা', 'নাগকেশর', 'অপরাজিতা', 'জাগরণী', 'নীহারিকা', 'মহাভারতী', 'পাঞ্চজন্য' উল্লেখযোগ্য। "খেয়া-ডিঙি" কবিতাটি তাঁহার 'রেখা' (১৯১০) হইতে সংকলিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ১৮৬১, ৭ই মে; মৃত্যু ১৯৪১, ৭ই আগস্ট। নিবাস—জোড়াসাঁকো, কলিকাতা; পরে শান্তিনিকেতন, বীরভূম। আধুনিক ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, পৃথিবীর সকল কালের কবিসমাজে অন্যতম প্রধান কবি। গীতিকবিতায় অদ্বিতীয়। শিশুকাল হইতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন এবং কৈশোর অতিক্রান্ত না হইতেই কবিখ্যাতি লাভ করেন। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২) প্রকাশিত হইবার পর, এক সভায় বঙ্কিমচন্দ্র নিজের গলার মালা পরাইয়া তাঁহাকে সম্বর্ধিত করেন। সাহিত্যের সর্ববিভাগে তাঁহার দান বিপুল। গল্প, উপন্যাস, ব্যঙ্গ, কৌতুক, প্রবন্ধ, দিনলিপি, ভ্রমণকাহিনী, প্রার্থনা ও ধর্মোপদেশ, শিক্ষা, রাজনীতি ও দেশপ্রেম-বিষয়ক প্রবন্ধ, নাটক, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, রূপক নাট্য, প্রহসন— একা একজনের হাতে বাংলা গদ্যসাহিত্য এমন ভাবে আর পুষ্ট হয় নাই। কবিতায় ও গানে বাংলা কাব্যসাহিত্যকে তিনি একা সহস্রবর্ষের সমৃদ্ধি দান করিয়াছেন। তিনি তিন শতেরও অধিক গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র জন্য তিনি নোবেল-পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হন। নাইট-উপাধিতে ভূষিত হইবার পরে, জালিয়ানওয়ালাবাগ-অত্যাচারের প্রতিবাদে তাহা বর্জন করিয়া তিনি দেশবাসীর আরও প্রিয় হইয়াছিলেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয়, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন তাঁহার অবিস্মরণীয় কীর্তি।

"কবিসার্বভৌম" উপাধি তাঁহারই উপযুক্ত। মৃত্যুর চারি মাস পূর্বে জন্মদিনে পঠিত তাঁহার "সভ্যতার সংকট" ভাষণ ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সত্যপথের ইঙ্গিত দিয়াছে। নিম্নলিখিত বইগুলি হইতে তাঁহার গদ্য ও পদ্য রচনা সংকলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে: 'বিচিত্র গল্প' (১৮৯৪) হইতে "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন"; 'কথা' (১৯০০)— "প্রতিনিধি", "পূজারিনী", "মস্তকবিক্রয়"; 'কল্পনা' (১৯০০)— "জুতা-আবিষ্কার"; 'নৈবেদ্য' (১৯০১)— "ন্যায়দণ্ড"; 'আত্মশক্তি' (১৯০৫)— "স্বাধীন শিক্ষা" ("ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ"— ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে ১৩১১, ১৭ই চৈত্র তারিখে পঠিত); 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০)— "ভারততীর্থ", "দুর্ভাগা দেশ"।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

জন্ম ১৮৬৪, ২০শে আগস্ট; মৃত্যু ১৯১৯, ৬ই জুন। নিবাস— টেঁয়া-বৈদ্যপুর, মুর্শিদাবাদ। রামেন্দ্রসুন্দর মেধাবী ছাত্র ছিলেন, তিনি এম.এ. পরীক্ষায় বিজ্ঞানে (পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র) প্রথম স্থান অধিকার করেন ও কলিকাতা রিপন কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়া অল্প কালের মধ্যেই অধ্যক্ষ-পদে উন্নীত হন। স্কুলে পড়িবার সময় কবিতা লিখিয়া তাঁহার সাহিত্যসাধনা শুরু হয়। পরে বাংলাসাহিত্যের উন্নতি-সাধন তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইয়াছিল। বি.এ. পড়িবার সময় তাঁহার প্রথম বাংলা প্রবন্ধ 'নবজীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তদবধি দুরূহ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিষয়ে তিনি বহু সরস প্রবন্ধ রচনা করিয়া বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে বিশেষভাবে পুষ্ট করিতে থাকেন। বিজ্ঞান-দর্শন বিষয়ে তাঁহার সমতুল্য লেখক বাংলাদেশে আর নাই। তাঁহার রচিত 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা', 'কর্ম্ম-কথা', 'চরিত-কথা', 'বিচিত্র প্রসঙ্গ', 'শব্দ-কথা', 'বিচিত্র

জগৎ’, ‘বস্তু-কথা’, ‘নানা কথা’, ‘জগৎ-কথা’ প্রভৃতি গ্রন্থ বিখ্যাত। তাঁহার হাতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নবজীবন লাভ করিয়াছিল। “নিয়মের রাজত্ব” প্রবন্ধটি তাঁহার ‘জিজ্ঞাসা’ (১৯০৪) হইতে সংকলিত হইয়াছে।

শরৎকুমারী চৌধুরাণী

জন্ম ১৮৬১, ১৫ই জুলাই ; মৃত্যু ১৯২০, ১১ই এপ্রিল। নিবাস—কলিকাতার চোরবাগান, পরে লাহোর। লাহোরের বাংলা ও ইংরেজী বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। তাঁহার রচিত ‘শুভবিবাহ’-নামক সামাজিক চিত্রটি বাংলাসাহিত্যের সম্পদরূপে গণ্য, রবীন্দ্রনাথের ‘আধুনিক সাহিত্য’ গ্রন্থে ইহার উচ্চ প্রশংসা আছে। তাঁহার সমগ্র রচনাবলী সংগৃহীত হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক ‘শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী’ নামে প্রকাশিত হইয়াছে। “লক্ষ্মীর শ্রী” প্রবন্ধটি তাহা হইতেই সংকলিত। ইহা ১৩১৭ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের ‘ভারতী’তে প্রথম প্রকাশিত হয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ১৮৭৬, ১৫ই সেপ্টেম্বর ; মৃত্যু ১৯৩৮, ১৬ই জানুয়ারি। নিবাস—দেবানন্দপুর, হুগলী। বাল্যে দেবানন্দপুরেই গল্প-রচনায় তাঁহার হাতে-খড়ি। পরে কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে ভাগলপুরে মাতুলালয়ে সাহিত্য-সাধনা বিশেষ অগ্রসর হয়। কিন্তু সত্যকার সাহিত্যজীবনের আরম্ভ বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে ব্রহ্মপ্রবাসে। গল্প ও উপন্যাস -রচনায় অপূর্ব কৃতিত্ব দেখাইয়া তিনি কথাসাহিত্য-সম্রাট্ আখ্যা লাভ

করিয়াছেন। প্রথম মুদ্রিত রচনা 'কুন্তলীন-পুরস্কার ১৩০৯ সন' পুস্তকের "মন্দির" গল্প। 'ভারতী' পত্রিকায় ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত "বড়দিদি" গল্পের জন্য সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত ইহাই তাঁহার প্রথম পুস্তক। পরে 'বিরাজ বৌ', 'বিন্দুর ছেলে', 'পরিণীতা', 'পণ্ডিত মশাই', 'পল্লী-সমাজ', 'চন্দ্রনাথ', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'অরক্ষণীয়া', 'শ্রীকান্ত' ১-৪ পর্ব, 'দেবদাস', 'নিষ্কৃতি', 'চরিত্রহীন', 'দত্তা', 'গৃহদাহ', 'দেনা-পাওনা', 'হরিলক্ষ্মী', 'পথের দাবী', 'শেষ প্রশ্ন', 'বিপ্রদাস' প্রভৃতি তাঁহার অনেক গল্প উপন্যাস বাহির হইয়াছে। অল্প কালের মধ্যে তাঁহার ন্যায় জনপ্রিয়তা আর কোনও লেখক লাভ করেন নাই। সংকলনটি 'হরিলক্ষ্মী' (১৯২৬) হইতে গৃহীত। এই "মহেশ" গল্পটি সর্বপ্রথম 'বঙ্গবাণী' মাসিকপত্রের ১৩২৯ আশ্বিন-সংখ্যায় বাহির হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

জন্ম ১৮৮২, ১২ই ফেব্রুয়ারি; মৃত্যু ১৯২২, ২৫শে জুন। নিবাস— চুপী, বর্ধমান; পরে দর্জিপাড়া, কলিকাতা। খ্যাতনামা অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র; বি.এ. পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন কিন্তু পাস করেন নাই, চাকরিও করেন নাই, সাহিত্যসেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁহার দেশপ্রীতি ছিল অপরিসীম। ১৮ বৎসর বয়সে (১৯০০) প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা' প্রকাশিত হয়। 'জন্মদুঃখী' (অনূদিত উপন্যাস), 'চীনের ধূপ' (নিবন্ধ), 'রঙ্গমল্লী' (কবিতায় ও গদ্যে অনূদিত নাটকাবলী) ও 'ধূপের ধোঁয়ায়' নাটিকা ছাড়া তাঁহার রচিত বাকি পনেরোখানি (একখানি সঞ্চয়ন গ্রন্থ না ধরিয়া) গ্রন্থই কাব্য। সমসাময়িক ঘটনা ও মানুষের উপর তিনি অনেক কবিতা লিখিয়াছেন, বহু কবিতা এখনও সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠাতেই আছে। ছন্দের উপর তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল; তাঁহার ছন্দোজ্ঞানের

বিশেষ প্রমাণ "ছন্দ সরস্বতী" ('ভারতী', বৈশাখ ১৩২৫) প্রবন্ধেও পাওয়া যায়। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে 'প্রবাসী' পত্রে প্রকাশিত (আষাঢ়-কার্তিক ১৩৩০) 'ডঙ্কানিশান' নামক অসম্পূর্ণ রচনা সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সম্পূর্ণ হইলে· ·বাঙ্গালা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর আদর্শ ঐতিহাসিক উপন্যাস হইত।" কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ— 'বেণু ও বীণা', 'হোমশিখা', 'তীর্থ-সলিল', 'তীর্থরেণু', 'ফুলের ফসল', 'কুহু ও কেকা', 'তুলির লিখন', 'মণি-মঞ্জুষা', 'অভ্র-আবীর', 'হসন্তিকা', 'বেলাশেষের গান', 'বিদায় আরতি'। "আমরা" কবিতাটি 'কুহু ও কেকা'য় (১৯১২) আছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

জন্ম ১৮৫৩, ৬ই ডিসেম্বর; মৃত্যু ১৯৩১, ১৭ই নবেম্বর। নিবাস—নৈহাটি, চব্বিশ-পরগনা। ইনি সংস্কৃত কলেজের একজন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন, পরে উহার অধ্যক্ষ-পদ লাভ করেন। তিনি যৌবনকালেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় লিখিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার ভাষা অতিশয় সরস, পণ্ডিত হইলেও ভাষার সরলতা-রক্ষায় ইনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে ইঁহার গল্প উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলী বাংলাসাহিত্যের সম্পদ হইয়া রহিয়াছে। অতি দুরূহ কঠিন বিষয়েও ইনি সরস প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন। ইনি তিন বৎসর কাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. লিট্. উপাধি-দানে সম্মানিত করেন। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং বহু প্রাচীন মূল্যবান পুঁথি আবিষ্কার ও প্রকাশ করিয়া উভয় প্রতিষ্ঠানকেই গৌরবমণ্ডিত করিয়া

গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' তাঁহারই আবিষ্কার। 'ভারতমহিলা', 'বাল্মীকির জয়', 'মেঘদূত ব্যাখ্যা', 'কাঞ্চনমালা', 'বেণের মেয়ে', 'প্রাচীন বাংলার গৌরব', 'বৌদ্ধ-ধর্ম' প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার মাতৃভাষায় সাহিত্যসেবার নিদর্শন। এখানে 'ভারতমহিলা' (১৮৮১) হইতে কিয়দংশ সংকলিত হইয়াছে।

গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' তাঁহারই আবিষ্কার। 'ভারতমহিলা', 'বাল্মীকির জয়', 'মেঘদূত ব্যাখ্যা', 'কাঞ্চনমালা', 'বেণের মেয়ে', 'প্রাচীন বাংলার গৌরব', 'বৌদ্ধ-ধর্ম' প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার মাতৃভাষায় সাহিত্যসেবার নিদর্শন। এখানে 'ভারতমহিলা' (১৮৮১) হইতে কিয়দংশ সংকলিত হইয়াছে।